হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদত

# জাগো-সাক্ষ্য দাও

ডঃ আলী শরীয়তী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবদুছ ছাত্তার চৌকদার

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা – বাংলাদেশ

# জাগো-সাক্ষ্য দাও

মূল ঃ ডঃ আলী শরীয়তী

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুছ ছাত্তার চোকদার

প্রকাশনায় ঃ
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
বাড়ী নং-৩৯, সড়ক নং-২
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা,
ঢাকা-৫

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

মুদ্রণে ঃ
তিতাস প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩, যদুনাথ বসাক লেন,
( টিপু সুলতান রোড ) ঢাকা—১
ফোন ঃ ২৫১৬৯৪
২৩৯৪১৫

Martyrdom : Arise and Bear witness

Translated by : MD. ABDUS SATTAR, CHOKDAR

Published by : Cultural centre of the Islamic Republic of Iran. House No. 39, Road No. 2 Dhanmondi Residential Area. Dhaka-5

Date of Publication : September—1985

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রকাশকের কথা

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের একজন তাত্ত্বিক ডঃ আলী শরীয়তী ( জন্ম ১৯৩৩ ) ছিলেন আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী। তীব্র আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত সমকালীন ইরানের মধ্যবিত্ত সমাজের একজন তত্ত্বগুরু হিসেবে ডঃ শরীয়তী আজ বিশ্বচৈতন্য ধারায় এক নব দিগন্ত যোগ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তৌহীদ, রেসালত, কিয়ামত, ইমামত ইত্যাদি ইসলামী ধর্মীয় ভিত্তিগুলো সমাজ বিপ্লবের ঐতিহ্যবাহী উপাদান হিসেবে কোন অবস্থান থেকে সভ্যতার বিবর্তনে অঙ্গুলি নির্দেশদানে সক্ষম—ডঃ শরীয়তীর সৃজনশীল ভাবনা-সম্পদ তারই চমৎকার ব্যাখ্যারূপে তৃতীয় বিশ্বের উত্থান পর্বের গতি-প্রকৃতির অনুসরণে অত্যন্ত মূল্যবান সহায়ক শাস্ত্র নির্মাণ করেছে। ডঃ শরীয়তী ছিলেন সমাজতত্ত্বের মেধাবী ছাত্র ও অধ্যাপক। বিপ্লবী ধ্যান-ধারণার জন্যে রেজাশাহ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ কারারুদ্ধ এবং সাভাক সদস্যদের হাতে গুপ্ত হত্যার লণ্ডনে আত্মগোপনরত অবস্থায় শাহাদতপ্রাপ্ত (জুন, ১৯৭৭)।

এ গ্রন্থটি মূলতঃ ইমাম হোসাইনের (আঃ) শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ডঃ আলী শরীয়তীর প্রদত্ত বক্তৃতা যা পরবর্তী পর্যায়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমানদের নিকট ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদত ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে, হোসাইনের শাহাদতের ওপর লিখা অনেক বই থাকা সত্ত্বেও ডঃ আলী শরীয়তী তার সুনিপুণ ও দক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহান ইমামের শাহাদতের ইতিহাস, দর্শন ও আদর্শকে সম্পূর্ণ অভিনব আঙ্গিকে অত্যন্ত সফলতার সংগে তুলে ধরেছেন যা ইরানের আধুনিক শিক্ষিত যুব সমাজকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের জন্যে অনুপ্রাণীত করেছে। বলা যায় আজকের সফল ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তি বিনির্মাণে, চিন্তা-চেতনা, সাহসিকতা, সর্বাত্মক ত্যাগ ও কোরবানীর ক্ষেত্রে যাঁরা অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন

রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ আলী শরীয়তী একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছেন। মুসলিম জাতি তাঁর এ মূল্যবান অবদানকে সব সময় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

বাংলাভাষী ভাইরা তাঁর এ মহামূল্যবান গ্রন্থ পাঠে ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবেন বলে আমাদের ধারণা।

প্রকাশক,
সাংস্কৃতিক বিভাগ
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান
বাংলাদেশ, ঢাকা।

# অনুবাদকের কথা

## ( ইংরেজী থেকে বাংলায় )

### রহমানুর রাহীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে

ইরানের দার্শনিক কবি ডঃ আলী শরীয়তীর Martyrdom : Arise And Bear Witness ( বাংলায় নামকরণ করা হলো, "ডঃ শরীয়তীর হোসাইনের শাহাদত ঃ জাগো-সাক্ষ্য দাও" ) পুস্তক অনুবাদের দুঃসাহসিক কর্মের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। দুঃসাহসিকতা বৈ কি ! ডঃ আলী শরীয়তীর পুস্তক অনুবাদের জন্যে উপযুক্ত'ত একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। কিন্তু এ' অধমই এ' ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করেছে এ জন্যে যে শাহাদত তাঁর জীবনেরও লক্ষ্য। শাহাদতের ব্যাপারে তাই অনুভূতি প্রবণ সে। শাহাদত অত্যাবশ্যক, সর্বাধিক আকাংখিত একটা ফুল যার আঘ্রাণের মধ্যে বেহেশতের সুবাস অনুভূত হয়, অবশ্য সে নাসারন্ধ্রে , শাহাদত আলিঙ্গনের জন্যে যে গভীর উদগ্রীবতা নিয়ে প্রতীক্ষমান। আর এ' পুষ্প পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল নবী-এ-দোজাঁহা সরওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রাণপ্রতিম দৌহিত্র হযরত হোসাইন (আঃ) এর জীবনে কারবালার প্রান্তরে। হোসাইন (আঃ) জানতেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কেননা, না আছে সামরিক শক্তি, না আছে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাদি—সম্পূর্ণ একা তিনি। কিন্তু না—ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে ইতিহাসের বুকে বাতিলের বিরুদ্ধে হকের পক্ষে সাক্ষ্য ঘোষণার জন্যে, শাহাদতের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে অবশ্যই এ' কঠিন দায়িত্ব আনজাম দিতে হবে তাঁকে। তাইত তিনি তাঁর গুটিকয়েক সঙ্গীদের নিয়ে ইয়াজিদের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শাহাদত বরণ করে প্রমাণ করে দিলেন ক্ষমতা ও শক্তির মালিক না হলেও শাহাদতের দায়িত্ব পালন করতে হবে, এটা প্রত্যেকটি মুমিনের দায়িত্ব। ফরজ ইবাদত হজ্জ অসমাপ্ত রেখে শাহাদত প্রদানের কাজকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তিনি আমাদের জন্যে এ' শিক্ষাও রেখেছেন যে, আল্লাহর অনভিপ্রেত স্বৈরশাসক যখন ইসলামী হুকুমত পরিচালনা করছে একজন মুমীনের দায়িত্ব হচ্ছে তখন তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করা। একজন ফাসেকের নেতৃত্বে ইসলামের কোন

অনুষ্ঠান পরিচালিত হতে পারে না। মুসলমান পারে না একই সাথে হক ও বাতিল উভয়ের আনুগত্য করতে। ইমাম হোসাইনের এ শিক্ষা, শাহাদতের এ' দিক্ষা শিয়া-মাজহাবী ভাইদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংগ। হোসাইন (আঃ) বলতেন ঃ "জীবন কিছু নয় বরং বিশ্বাস ও জিহাদের সমন্বয়।" সত্য বলতে কি, ইসলামকে বিজয়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রদ্বয় হচ্ছে জিহাদী চেতনা ও শাহাদতের প্রেরণা। অবশ্য এ' দুটির উৎস হচ্ছে ঈমান। আবার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ' দু'টির মধ্য দিয়েই।

এটা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি ইরানী ইসলামী বিপ্লবের সফলতার মূল কারণ তাঁদের বংশানুক্রমিকভাবে লালিত জিহাদী চেতনা ও শাহাদতী প্রেরণা। মুসলিম দুনিয়ার সম্মুখে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা, আর রয়েছে আল্লাহর মদদ লাভের বিরাট প্রত্যাশা। কোরআনে কারিমায় বর্ণিত হয়েছে। "তোমরা বের হয়ে পড়—হালকা হোক বা ভারী হোক যা' কিছু আছে তা' নিয়ে। আর জেহাদ কর আল্লাহর পথে, নিজের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সংগে নিয়ে, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণময় —যদি তোমরা জান।"

( সূরা তওবা ৪১ নং আয়াত )

হাঁ, আল্লাহর মদদ পেতে হলে আল্লাহর দিকে এগুতে হবে আমাদের। তবেই না তিনি এগিয়ে আসবেন আমাদের দিকে। বার বার জিহাদের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে কোরআনে—জিহাদ হচ্ছে ফরজ। শাহাদতের মর্যাদার ওয়াজও প্রতিনিয়তই শুনছি আমরা। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক পশ্চাতে অবস্থান করছি। পশ্চাতবর্তীরা বিজয় আনবে কেমন করে? না। এ সত্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। শাহাদতের পথে অর্জন করতে হবে পার্থিব ও আত্মিক উভয় বিজয়। আর তা হলেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব। আল্লাহ আমাদেরকে শাহাদতের ব্রত গ্রহণের এবং সে মতে আমল করণের তৌফিক দিন। আমীন।

—মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার চৌকদার
অনুবাদক, ঢাকাস্থ ইসলামী ইরানের
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

# অনুবাদকের কথা

( মূল থেকে ইংরেজীতে )

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে—

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের যথার্থ মূল্যায়নের পর্যায় এখনও আসেনি, তবে এ জন্যে প্রয়োজন সে বিপ্লবের ভিত্তি, উত্থান, অগ্রগতি এবং বিজয়ের সঙ্গে কার্যকরী ছিল যে সকল উপাদান সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা।

এ অনন্য বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ যে জিনিসটি মনোযোগ আকর্ষণ করে তা' হচ্ছে এর আদর্শিক ভিত্তি যা ইসলাম এবং বিশেষতঃ যা শিয়া মাজহাব ভিত্তিক।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর (তৃতীয় শিয়া ইমাম যিনি শাহাদতপ্রাপ্ত) মতে শিয়া মাজহাবের চিন্তাধারা হচ্ছে যে, জীবন আর কিছুই নয় বরং বিশ্বাস ( আকায়েদ ) ও জিহাদ ( আত্মিক ও বাহ্যিকভাবে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সংগ্রাম )।

স্বল্প কথায় শিয়া মাজহাব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব নয়, তবে শিয়া-চিন্তাধারায় জিহাদের যে অস্তিত্ব তা' হচ্ছে একটা সংগ্রাম যার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শাহাদত। শিয়া মতে শাহাদত হচ্ছে ঈপ্সিত লক্ষ্যে সচেতন ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত আত্মোৎসর্গ।

যুগ যুগ ধরে শাহাদত সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা ও লেখা হয়েছে কিন্তু আলী শরীয়তীর মত এমনি স্বচ্ছ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কেউ উপস্থাপন করেননি। তাঁর চিন্তাধারা, আদর্শ, মতামত, পুস্তকাদি ও বক্তৃতামালা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তি, উত্থান, ক্রমবিকাশ ও সফলতা লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

'শাহাদত ঃ জাগ, সাক্ষ্য দাও' এর যথাযথ অনুবাদ পেশ করার জন্যে সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে পাঠকদের নিকট আমরা ক্ষমাপ্রার্থী এবং ভবিষ্যতে মুদ্রণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এ ধরনের পরামর্শদান স্বাগত জানাই।

ওয়াসসালাম

এ, এ, কাসেমী।

# সম্পাদকের কথা

কারবালায় প্রত্যাবর্তন অর্থই হচ্ছে শাহাদতের পথকে বরণ। সে সকল আত্মা যেগুলো সেদিন চেতন হয়েছিল, সাক্ষ্যবহন করছিল আল্লাহর সঙ্গে তাদের অঙ্গীকারের বিষয়ে; অনেক অনেক যুগ আগে—এতই আগে যে, সে সম্বন্ধে সবার চেতনা খেই হারিয়ে ফেলে, সেদিন স্রষ্টা প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" এবং আমরা উত্তরে বলেছিলাম, "হাঁ, আমরা সাক্ষ্যবহন করছি।' (কোরআন ৭ঃ ১৭২)। সে পবিত্র দিনে মনুষ্যজীব হিসেবে সৃষ্টিকর্তার কাছে দায়ী থাকব এমনি ওয়াদা আমরা করেছিলাম। ওয়াদা করেছিলাম পরোক্ষভাবে ধরিত্রী, স্রষ্টার সৃষ্টি এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের হেফাজতের দায়িত্ব এবং সক্রিয়ভাবে খোদাওন্দতায়ালার সৃষ্টি ও তাঁর সৃষ্টি প্রাণীকুলের বিনাশকারী শক্তিকে প্রতিহত করার গুরুভার বহন করব।

এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব যে সকল কর্মতৎপরতা-যোগ্যতা সহ সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ নিয়ে অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কেউ তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে, কেউবা বাক্য ব্যয়ে, কিন্তু আমাদের প্রিয় ইমাম হোসাইন তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করলেন। যে সত্যের তিনি ধারক ও বাহক ছিলেন সে সত্যের জন্যে তিনি জীবনপণ সংগ্রাম করলেন—বিকল্প পথ শাহাদতের পথ তিনি গ্রহণ করলেন এবং প্রভু তা' স্বাগত জানালেন।

প্রাচীন ব্যবিলন নগরীর সন্নিকটে কারবালার সমভূমিতে ৬৮০ খৃস্টাব্দে ইমাম হোসাইন, তাঁর পরিবার এবং সঙ্গী সাথীরা ইয়াজীদের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

ইমাম হোসাইন, তৃতীয় শিয়া-ইমাম, হযরত আলী ( আঃ ) ও ফাতিমার পুত্র, ইসলামের নবী ( দঃ ) এর দৌহিত্র যিনি শহীদদের বাদশাহ, শাহ-ই-শহীদান নামে পরিচিত—এ জন্যে যে তিনি ইসলামের জন্যে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন।

উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া যখন মৃত্যুবরণ করেন ইমাম হোসাইনের বয়স তখন প্রায় ৫৬ বছর। ইমাম হিসেবে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন দশ বছর ( মুয়াবিয়া কর্তৃক তার ভ্রাতা নিহত হওয়ার উত্তরকালে )!

এমনি এক পরিবেশে ইমাম হোসাইন কালাতিবাহিত করছিলেন যখন চলছিল দমন, নিপীড়ন ও নির্যাতন। ডঃ শরীয়তীর মতে অধিকাংশ ধর্মীয় বিধান গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। উমাইয়া সরকারের প্রবর্তিত আইনই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। হযরত আলীর নাম-নিশানা এবং নবী (দঃ) এর পরিবারবর্গকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সম্ভাব্য সকল পন্থাই মুয়াবিয়া গ্রহণ করে। সে চেয়েছিল তার পুত্র ইয়াজিদের অবস্থান শক্তিশালী করতে। এ জন্যে ইমাম হোসাইনকে সহ্য করতে হয়েছে মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে নানা দুশমনী। তার মৃত্যুর পরে পুত্র ইয়াজিদ যখন খেলাফতে সমাসীন হলো তখন ইমাম হোসাইনকে অধিকতর দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হলো।

মদীনার গভর্নরকে ইমামের আনুগত্য আদায়ের ব্যাপারে যখন নির্দেশ প্রদান করা হলো তিনি বুঝলেন মদীনা ছেড়ে মক্কা যেতে হবে। সরকারের স্থায়ীত্বের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইসলামী ঐতিহ্য মতে আনুগত্য লাভ। বিরাজমান উল্লেখযোগ্য শক্তিগুলোর আনুগত্য ছাড়া কোন সরকারের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। কারো দ্বারা আনুগত্য বিচ্ছিন্ন করার বিষয়টি অপরাধ বলে বিবেচিত হ'ত এবং এটা আনয়ন করত অপমান ও অবমাননা। নবীর জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে জনতা বুঝতো যে স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য যা' বলপ্রয়োগে আদায় করা হয়নি তার মধ্যে নিহিত রয়েছে শাসন করার অধিকার ও মর্যাদা।

মুয়াবিয়া হাদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল যে ইমামের প্রতি বলপ্রয়োগ বিরাজমান স্বাভাবিক পরিবেশের অবনতিই ঘটাবে। ইমাম হোসাইনের আনুগত্য আদায় বিষয়ে বলপ্রয়োগ না করার জন্যে পিতার যে অন্তিম উপদেশ ইয়াজিদ তা' রক্ষা করেনি। বরং ত্বরিৎ আনুগত্য আদায়ের জন্যে সে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, ইমাম হোসাইন পালিয়ে গেলেন মক্কায় এবং কাবাগৃহে শরণার্থী হলেন।

তিনি সে নগরীতে চার মাস অতিবাহিত করলেন। এ' সময়ে সারা মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর নিকট পত্র ও বয়াতের প্রতিশ্রুতি আসতে শুরু করল তাদের নিকট হতে যারা স্বৈরাচারী উমাইয়া খেলাফতের উচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁর সহায়তা কামনা করছিল। বিশেষ করে কুফাবাসীগণ তাঁকে আহবান জানালেন তাদের মধ্যে বসবাস করতে এবং তাদের শাসন করতে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমাম হোসাইনের পক্ষে মদীনায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হলো না কেননা সেটা করলে তা' একটা না-ইন্‌সাফ ও অত্যাচারী সরকারের স্বীকৃতি দেয়ারই নামান্তর হতো। এটা হতো ইসলামের প্রকাশ্য অবমাননা। এমন কাজ তিনি করতে পারলেন না, পারলেন না ইসলামের সঙ্গে বিদ্রোহ করতে অথচ জানতেন নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সরাসরি কুফায় যাওয়াটাও ছিল বিপজ্জনক তথাকার জনগণ পুরোপুরি বিশ্বস্ত ছিল না।

অথচ তিনি সরাসরি যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন। এ সিদ্ধান্তই তাঁর জন্যে হলো কাল। কুফার যে স্থানের দিকে তিনি যাত্রা করেছিলেন ২০ বছর পূর্বে সেখানে তাঁর পিতা নিহত হন।

তিনি তাঁর জেঠতুত ভ্রাতা মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফার বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে পাঠালেন। প্রথম দিকে ইবনে মুসলিম কুফার অনেকের নিকট থেকে বয়াত-লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ইমাম হোসাইনের নিকট কুফাবাসীদের বয়াত গ্রহণ ও সহৃদয়তা প্রদর্শনের শুভ সংবাদ পাঠালেন। একদিন ইমাম হোসাইন সে সংবাদ পেয়ে নিজে স্বপরিবারে সাথীগণসহ কুফা পানে ধাবিত হলেন। ইতিমধ্যে ইবনে মুসলিমের তৎপরতার সংবাদ ইয়াজিদের কর্ণগোচর হয় যা তাঁকে রোষানলে নিক্ষেপ করে। ইমাম হোসাইনের প্রেরিত ব্যক্তির তৎপরতা বন্ধ করার জন্যে সে তার পুত্রকে নির্দেশ প্রদান করলো। তখন ইয়াজিদ তনয় জাইয়িদ ইবনে মুসলিমকে হত্যা করে।

কুফা যাত্রার কয়েক দিনের মধ্যে ইমাম হোসাইন মুসলিম এবং তার পুত্রের নিহত হওয়ার বিষয় অবগত হলেন। এ সংবাদ এবং অন্যান্য সর্তক সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও ইমাম হোসাইন পিছপা' হওয়ার পরিবর্তে কুফার দিকেই এগিয়ে চললেন। তিনি জ্ঞাত হলেন যে শহরের সিংহদ্বারে রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে এবং তাঁকে সেখানে শহরে প্রবেশের ব্যাপারে বাধা প্রদান করা হবে। তথাপি তিনি মৃত্যুর পথেই দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

কুফা থেকে অনুমান ৪২ মাইল দূরে কারবালা নামক এক মরুপ্রান্তরে ইয়াজিদের সেনাবাহিনী ইমাম এবং তাঁর অনুগামী লোকজনকে ঘেরাও করে। এই অকুল স্থানে আট দিন অতিবাহিত হয় এবং এর মধ্যে অবরোধকারী

সৈনদের ঘেরাও নিকটতর হতে থাকে, বৃদ্ধি হতে থাকে তাদের সংখ্যাও। অবশেষে ইমাম, তাঁর পরিবারবর্গ এবং কিছু অনুসারী ত্রিশ হাজারের এক বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। দুশমন বাহিনী ফুরাত নদী হতে তাদের বিচ্ছিন্ন করার ফলে তাঁরা সবাই সে ভয়ানক উষ্ণ মরুভূমিতে তৃষ্ণা-কাতর হন।

যেহেতু তাঁর সঙ্গে অবস্থান করার অর্থই হচ্ছে মৃত্যু, তাই ইমাম সাথীগণকে তাঁর সাহচর্য ত্যাগের জন্যে আহবান জানালেন। তিনি তাঁদেরকে বলেন যে, দুশমন কেবল তাঁকেই চায় এবং তাঁরা (সঙ্গীরা) সেখানে থাকার ব্যাপারে বাধ্য নয়। প্রচলিত মতে কারবালার যুদ্ধে ৭২ জন যুদ্ধা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ৬৮০ খৃস্টাব্দের মুহররমের দশ তারিখে ইমাম দুশমনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল ক্ষুদ্র একদল অনুগামী যার সংখ্যা হবে নব্বই এর নীচে এবং এর মধ্যে তাঁর চল্লিশ জন ভক্ত, ৩০ জন শত্রুবাহিনী ত্যাগী সৈন্য যারা যুদ্ধের রাতে ও দিনে তাঁর পক্ষাবলম্বন করেছে, এবং শিশু, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং জেঠতুত ভ্রাতা সম্বলিত হাশেমী পরিবারের সদস্যবৃন্দ। সে দিন জীবনপণ তাঁরা লড়েছেন এবং ইমাম, হাশেমী পরিবারের যুবকবৃন্দ এবং ভক্তবৃন্দ সবাই শাহাদতের পেয়ালা পান করেন।

## কারবালার প্রতিধ্বনি

১৩০০ বছর ধরে কারবালা যথার্থ স্বকীয়তা নিয়ে ইরানী জনতার জীবনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ' অনুরণন স্বচ্ছ স্ফটিকের মত পরিলক্ষিত হয় 'জীবন্ত-কলার' মধ্যে।

শাহাদতের এ' প্রেরণা আরম্ভ হয়েছে তখন, যখন 'প্রাণবন্ত শিল্পী' তার মনোভাব প্রকাশ করছে এর মাধ্যমে ( নিয়াত কারদান )।

এ' বাসনা (Intention) মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে এমন এক প্রেরণা যোগায় যা' তাকে এমন কিছু প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে যার স্থান ব্যক্তি পরিমণ্ডলের অনেক উর্ধে।

অপরিমেয় এ' চেতনা। 'প্রাণবন্তকলা', এমনকি 'জীবনের জন্যে শিল্প,' ধর্মীয় চেতনার ব্যক্তিগত ও সমাজ সংক্রান্ত ঘোষণাদিতেও এর প্রভাব বর্তমান।

ব্যক্তি এক প্রাণবন্তকলা হিসেবে জন্মলগ্ন থেকেই আত্মপ্রকাশ করে এবং মৃত্যুর দ্বারা পূর্ণত্বে পৌঁছার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এর অবয়বে পরিবর্তন সাধিত

হতে থাকে। অবয়বের এ রূপান্তরে বিবিধ কার্যকরণ জড়িত থাকায় কোন বিশেষ উপাদানের প্রভাব সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ তথায় পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপাদানও রয়েছে। সে চারুশিল্পী যে কাদামাটি নিয়ে কাজ করে তা' তার হাতের কলাকৌশলের মতই সক্রিয়। শেষাবধি অবয়ব গোলাকৃতি ও মসৃনতাপ্রাপ্ত হয় এবং সংগোপনে রেখে যায় শিল্পীর দক্ষ হাতের কর্মকুশলতা।

ইসলামী অধিবিদ্যাবিদ ইবনে আরাবী দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে শিল্পকর্মের বিভিন্ন জড় ও সচেতন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন ঃ 'একজন শিল্পীর (জ্ঞানী) প্রতি লক্ষ্য কর, যে কাদামাটি রূপান্তরের মাধ্যমে জিনিস তৈরী করছে (তা' হচ্ছে জানার বিষয়), স্থূল দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে এটা মনে হতে পারে যে, শিল্পীর হাতের কাদামাটি জড় ও নিষ্ক্রিয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এটা অনেকেরই দৃষ্টির বহির্ভূত থেকে যায় যে, কাদামাটি শিল্পীর কারুকর্মে নিজস্ব ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবেই পালন করছে। এটা নিশ্চিত সত্য যে, শিল্পী কাদামাটি দিয়ে নানা জিনিসই তৈরী করতে পারে, কিন্তু মাটির প্রকৃতিদত্ত যে সীমাবদ্ধতা আছে সেটা কেউ অতিক্রম করতে পারে না। অন্যকথায় বলা যায়, কাদামাটি দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তু তৈরী সম্ভব তা তার প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয়।

শাহাদতের 'জাগ, সাক্ষ্য দাও, দৃষ্টিভঙ্গি এক দৃষ্টিতে বলা যায় যে তা' শিয়ামতেরই অংশ বিশেষ। এটা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য ও আচার-অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা যায় যা প্রাণবন্ত শিল্পীকে হোসাইনের মত বা হোসাইনে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় করে আর আলী শরীয়তী'ত হোসাইনের পথেই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।

# প্রথম অধ্যায় : শাহাদত

হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদত বার্ষিকীতে শাহাদত সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি খেই হারিয়ে ফেলছি।

ইমাম হোসাইন এবং ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা সমন্ধে যথেষ্ট লেখা ও বলা হয়েছে এবং হচ্ছে। অতীতের লোকেরা একভাবে তাঁকে তুলে ধরেছেন এবং নব্যপন্থীরা গ্রহণ করেছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। ইতিমধ্যে আমার যে আত্মোপলব্ধি হয়েছে তা'হচ্ছে ইমাম হোসাইন যা' করেছেন সে বিষয়টি আমরা শাহাদতের সত্যিকারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ছাড়া বুঝতে পারবো না। একদিকে ইমাম হোসাইনের মাহাত্ম্য অপর দিকে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিভঙ্গি যে 'ব্যক্তি হোসাইনকে' জন্ম দিয়েছে তা' লীন হয়ে গেছে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে। হোসাইন থেকে যার মূল্য অনেক উর্ধে তা' হচ্ছে সে' লক্ষ্য যার জন্যে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন। হোসাইন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই বলি কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি উদারতার সজে আত্মবিসর্জন করলেন সে সম্বন্ধে আমরা খুব কমই বলে থাকি।

আজ আমি ইমাম হোসাইন এবং অন্যারা যারা তার ভক্ত, তাঁরা আত্মোৎসর্গের যে আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং মানব ইতিহাস এবং আমাদের ধর্মে সে আত্মাহুতির মহত্ব সম্বন্ধে আমি কিছু বলার অভিলাষ রাখি।

তাই জনতার মাঝে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার পক্ষ থেকে সে দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আমি কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ এবং তার অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই যা তাদের জীবন ও মৃত্যুর বিনিময়ে প্রদর্শিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে শাহাদত।

এটা একটা কঠিন কাজ। সূচনাতেই আমি যা হৃদয়ঙ্গম করছি তা হচ্ছে আমার জ্ঞানের পরিধি, বুদ্ধিগত যোগ্যতা এ ধরনের দুরূহ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আনজাম দেয়ার ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দেয় না। এ সম্বন্ধে বিরাজমান মতপার্থক্য (বিশেষ করে আমার জন্যে) আমার বিষয়কে অধিকতর সঙ্গীন করে তুলে।

একদিকে আমি বুদ্ধিভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাহাদতের বিষয়টি আলোচনা করবো। আমিত শুধু আমার অস্তিত্ব

ব্যবহার করতে পারি। বিজ্ঞান এবং যুক্তিবিদ্যা আমাকে সহায়তা করতে পারে।

অপর পক্ষে, শাহাদতের ইতিহাস এবং শাহাদত যে চ্যালেঞ্জের ঘোষণা দেয় তা' এতই আবেগপ্রবণ এতই আকাঙ্খিত উদ্দীপনাময় যা অগ্নিকুণ্ডে স্পিরিট ঢেলে দেয়ারই সামিল। যুক্তি এখানে ভোঁতা হয়ে যায়। ভাষা খেই হারিয়ে ফেলে। এমনকি চিন্তাশক্তি হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। শাহাদত পরিশুদ্ধ ভালবাসা ও গভীর জটিল প্রজ্ঞার সমন্বয় হতে উদ্ভূত। একই সঙ্গে উভয়ের সঠিক উপস্থাপনার ব্যাপারে খুব কম লোকই সক্ষম তাই তারা সেগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে না।

বিশেষ করে আমার মত দুর্বল অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাহীন মানুষের জন্যে বিষয়টি কঠিনতর। তথাপি যে বিষয়গুলো আমি উত্থাপন করতে চাই সে'গুলো সফলজনকভাবে উপস্থাপনার ব্যাপারে আমি যারপরনাই চেষ্টা করবো।

শাহাদতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আদর্শিক যে চিন্তাধারা থেকে এটি তাৎপর্য, ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়ন পেয়েছে সেটা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

ইউরোপীয় ও পশ্চিমা পরিভাষায় 'মারটারডম' ( Martyrdom ) অর্থ হচ্ছে দুশমন থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে হেফাজতের জন্যে মৃত্যুবরণ, যখন মৃত্যুর পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ থাকে না।

কিন্তু শাহাদত শব্দটি যার অর্থ হচ্ছে 'জাগো ও সাক্ষ্য দাও', যা' ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এটি এমন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি মৃত্যুকে পছন্দ করেছেন। তবে পশ্চিমা মারটারডম শব্দের অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রয়েছে সে ক্ষেত্রে। ইসলামী ও অ-ইসলামী ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে একটা পার্থক্য নির্দিষ্ট রয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশে মারটার ( Martyr ) শব্দটি মরটাল ( Mortal ) শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হচ্ছে 'মৃত্যু' বা 'মৃত্যুকে বরণ করা'। ইসলামের— বিশেষ করে শিয়া মাযহাবের সংস্কৃতিতে একটা বিশেষ নীতি রয়েছে : "আত্মোৎসর্গ কর এবং সাক্ষ্য বহন কর।" সুতরাং মারটারডমের বা মৃত্যুর বিপরীতে এ ক্ষেত্রে যে অর্থবহন করে তা হচ্ছে : জীবন, সাক্ষ্য, পরীক্ষা করা, অনুমোদন দেয়া। এ' আত্মাহুতি এবং সাক্ষ্য বহন করা শব্দ দ্বারা শিয়া মাযহাবের সংস্কৃতির দর্পণের সঙ্গে দুনিয়ার অন্যান্য সংস্কৃতির পার্থক্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

## এর মাযহাবী দৃষ্টিকোণ ঃ

( সুতরাং ) শাহাদতের তাৎপর্য বুঝতে হলে যে মাযহাবের জঠরে এর উদ্ভব ও যাদের আমলিয়াতের মধ্যে এটি বর্তমান এবং যে' মাযহাব থেকে ইমাম হোসাইন এ প্রসংগে উৎকৃষ্টতম ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন সে মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিষয়টি আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে। সংগ্রামের ইতিহাসের গতিধারায়, মানব ইতিহাসে হোসাইন হচ্ছেন সংগ্রামের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ এবং তার কারবালা সকল যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যতম যা' সব যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে সেতুবন্ধক, যা' সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ভবিষ্যত বংশধরদের ও যুগের মধ্যে—শুরু থেকে অদ্যাবধি গোটা ইতিহাসের সময়কালে এবং ভবিষ্যতের জন্যেও।

আমাদের প্রারম্ভিক বক্তৃতাসমূহ যা ঐতিহাসিকভাবে শুরু হয়েছে ইব্রাহীম ( আঃ )-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে, সংগ্রামের সে' ঘটনা প্রবাহে হোসাইনের ভূমিকার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই হোসাইন প্রদত্ত অর্থ আমাদের কাছে কুজ্ঝটিকা মুক্ত হবে। এ' অর্থ সুস্পষ্ট করতে হলে হোসাইনের বিপ্লবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। হোসাইন এবং তার কারবালার ঘটনাকে যদি ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি, বাস্তবিক পক্ষেই যেমন আমরা অনেকেই দেখে থাকি, তবে সে মানুষটির বিষয় এবং ঘটনাটিকে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে প্রতীয়মান হবে। যদি এটিকে অতীতের একটি বিয়োগান্তক অনুতাপযোগ্য সাধারণ (আমরা অবশ্যই ক্রন্দনরত থাকব) ঘটনা বলে ভাবি তবে এর শাশ্বত আবেদন ও স্বর্গীয় দর্শনের বিষয়টি অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়। ঐতিহাসিক ও আদর্শিক দিক বাদ দিয়ে কারবালা ও হোসাইনকে পৃথকভাবে বিচার করলে তা হবে একটা জীবন্ত দেহ কর্তন করার মত যা করা হয়েছে এর কোন একটি অঙ্গের নিরাময়ের জন্যে এবং এটি হবে সে পরীক্ষার নামান্তর যে পরীক্ষায় দেহের সক্রিয় কার্য প্রণালী অন্তর্ভুক্ত নয়।

## দুই শ্রেণীর ধর্ম প্রবর্তক ঃ

আমার ইতিপূর্বেকার বক্তৃতাসমূহে আমি এ' কথা উল্লেখ করেছি যে, ধর্মের বিষয়বস্তু, ধর্ম প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাদের আচরণ-আখলাক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের শ্রেণীগত মর্যাদা এবং জনগণের সম্মুখে তাদের দাওয়াত যা গোটা মানব ইতিহাসে ও ধর্মীয় আন্দোলনসমূহে পরিস্ফুটিত হয় সে'গুলোর

দৃষ্টিতে তারা দু'ভাগে বিভক্ত। এ বিভক্তিকরণের দিক থেকে বিচার করলে, সত্যপন্থী হোক আর মিথ্যার প্রতিভূ হোক সকল ঐতিহাসিক প্রবর্তক, এমন কি যিনিই কোন ধর্মীয় আন্দোলন আরম্ভ করেছেন সবাইকে দু'টি অংশে ভাগ করতে হয়।

প্রথম দল হযরত ইব্রাহীম ( আঃ ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মাবলম্বীগণের উত্তরসূরী। নবীদের এই সিলসিলা ঐতিহাসিক দিক থেকে আমাদের নিকটতর বলে আমরা তাদের সম্বন্ধে অধিকতর জানি। এ' ক্রমধারার নবীরা শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ছিলেন চরমভাবে বঞ্চিত। মুহাম্মদ (দঃ) যেমন বলেন ঃ ইতিহাস প্রমাণ, এসব নবীগণ ছিলেন রাখাল, মেষপালকে ঘাস খাওয়াবার কাজ করেছেন, অথবা কিছু কিছু ছিল ক্ষুধার্থ কারিগর বা শ্রমিক।

এসব নবীগণের পার্থক্য রয়েছে ও' সকল ধর্ম প্রবর্তকের দল বা চীন, ভারত ও ইরানের বুদ্ধিভিত্তিক ও' নৈতিক চিন্তাধারা উৎসারিত ধর্ম উদ্ভাবক কিংবা এ্যাথেন্সের বিজ্ঞান ও নীতিবাদ ভিত্তিক ধর্মীয় প্রবক্তাদের সঙ্গে। এ পরবর্তী দল, দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা এসেছেন সমাজের সম্ভ্রান্ত, শক্তিধর, বিলাসপ্রিয় শ্রেণী থেকে।

ইতিহাসের পাতায় এটাই প্রমাণিত হয় যে সমাজের শক্তিমান শাসককুল তিনটি শ্রেণীভুক্ত যথা ঃ শক্তিশালী, সম্পদশালী এবং ধর্মীয় গুরু। তারা পরস্পরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং জনগণের বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। জনগণকে শাসন করার জন্যে তারা পরস্পরকে সহায়তা করে। তাদের এ মৈত্রী, দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতার জন্যে হতে পারে নাও হতে পারে, তবে তা' জনগণকে শাসন করার জন্যে, জনগণকে সামনে রেখে সৃষ্টি হয়।

ইন্দোচীন থেকে এ্যাথেন্স পর্যন্ত সে সকল প্রবর্তক যারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরসূরী নয়, হয় তাঁরা মাতৃক দিক থেকে নয় পৈত্রিক দিক থেকে কিংবা উভয় ক্ষেত্রে তারা সম্রাট, ধর্মগুরু কিংবা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। কনফুশিয়াস, লৎযু, বুদ্ধ, যরদস্তীয়, মুনি, মাযডাক, সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টেটল ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটি সত্য। অপর পক্ষে কোরআন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ঃ "আমরা তাদের জন্যে সাধারণ মানুষের মধ্য হতেই নবী নিযুক্ত করেছি। ( ৩ ঃ ১৬৩ ) তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষ, জনতা ও সমাজের

অন্তর্ভুক্ত। তাই দেখা যায় ইব্রাহীম (আঃ) সিলসিলার নবীগণ সাধারণ মানুষের মধ্য হতেই এসেছেন।

এর অর্থ এ নয় যে তাদের কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বা পূর্ণত্ব ছিল না এবং তাঁরা শুধুমাত্র মনুষ্যজীবই ছিলেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে যে, বিশেষ সম্ভ্রান্ত বা নির্বাচিত শ্রেণী হতে নয় বরং সাধারণ মানুষের মধ্য হতেই তাদের নিয়োগ করা হয়েছে।

অনেকে বিশ্বাস করেন যেহেতু ইসলামের নবী আরবীয়দের মধ্যে এসেছেন তাই তিনি আরবী বলেছেন, ইহুদীদের মধ্য থেকে এসেছেন যে মুসা (আঃ) তিনি বলেছেন হিব্রু। এটাত অনস্বীকার্য সত্য যে নবী আরবদের মধ্য হইতে এসেছেন তিনি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা বলতে পারেন না।

জনতার ভাষায় কথা বলার অর্থ হচ্ছে সে কণ্ঠস্বরে এবং বাচনভঙ্গীতে কথা বলা যা সমাজের সাধারণ মানুষ বুঝে। জনসাধারণের প্রয়োজন ও সমস্যার ব্যাপারে তাদেরকে এমন এক বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে হবে, এমন ভাষা ও বাকরীতি ব্যবহার করতে হবে, যা তাদের কাছে পরিচিত, দার্শনিক, কবি, বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত বা শিক্ষিতদের ভাষায় নয়। না তারা সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতির বিষয় বুঝতে পারে, না তারা সেটা চিন্তা করে। তারা জনতার ভাষা বুঝে না। সকল ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও পরিলক্ষিত হয়। আমরা যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর অনুসারী নবীদের প্রসংগে বলি তখন আসলে জনতার কথাই বলি। কেননা এসব পয়গাম্বরগণ মিশন জন্যদের বিপরীত।

ইব্রাহীমের সিলসিলাভুক্ত নয় এমন সব প্রবর্তকদের লক্ষ্য সমসাময়িক ক্ষমতাসীনগণ। তারা চায় ক্ষমতাসীনরা যেন প্রবর্তকের চিন্তাধারাকে সমর্থন দেয়। বিপরীত পক্ষে ইব্রাহীম-অনুসারীরা সব সময়েই শক্তিশালী শাসকগণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

ইব্রাহীমের (আঃ) প্রতি লক্ষ্য করুন। যখনই আল্লাহ তাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্তিসমূহ বিচূর্ণ করার জন্যে গদা উত্তোলন করলেন। মুসা তার রাঙ্গানী লাঠি হস্তে ধারণ করলেন এবং ফেরাউনের প্রাসাদকে দিলেন উড়িয়ে। শক্তিধর, ধনবান ক্রোয়েসাসকে তিনি ধরাশায়ী করলেন, সমাহিত করলেন মাটির তলে। ফেরাউনকে তিনি সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলেন। এবং ইসলামের নবী প্রথমতঃ ব্যক্তি-উন্নতি পর্যায় অতিক্রম

করেছেন, এর পর শুরু করেছেন তাঁর আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। ১০ বছরের মধ্যে ৬৫টি যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে—অর্থাৎ প্রতি ৫০ দিনে একটি যুদ্ধ একটি করে সামরিক প্রত্যাঘাত। ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুগামী নবীদের মিশনের মধ্যে রয়েছে অলৌকিকত্ব। যষ্টির সাপে রূপান্তরের বিষয়টি ব্যবহৃত হয়েছিল যাদু-বিদ্যা ধ্বংস এবং ফেরাউনের সিংহাসন আক্রমণের জন্যেই।

কোরআন এ' নীতি স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ইসলাম কোন নূতন ধর্ম নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে গোটা ইতিহাসে ধর্ম একটিই ছিল। প্রত্যেক নবীই সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং যুগের প্রয়োজন অনুকূলে এ ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

একটি ধর্ম আছে, যার নাম আনুগত্য—'ইসলাম'। এ ঘোষণার মাধ্যমে নবী বিষয়টির সার্বজনীনকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আনুগত্যের ধারণাকে করেন সার্বজনীন ও ঐতিহাসিক মতাদর্শে পরিণত। তিনি ইসলামী আন্দোলন এবং সে সকল আন্দোলন যেগুলো জনতার মুক্তির জন্যে সমগ্র ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে সংগ্রাম করেছে, পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। তারা ক্ষমতাধর, সম্পদশালী এবং প্রতারকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এভাবে তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মানব ইতিহাসের গতিপথে সকল অঞ্চল, কাল ও জনপদে তাঁরা একই আধ্যাত্মবাদের সংগ্রাম, একই ধর্ম, একই নীতি এবং একই ধ্বনি উত্থাপন করেছেন।

চলুন, কোরআনে পাকের এ' আয়াতে করীমার প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং এর ঐতিহাসিক পটভূমিকা শব্দচয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখি, লক্ষ্য করি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কোরআন কিভাবে উপস্থিত করেছে এবং এটাও পর্যবেক্ষণ করি যে এটি এ' সকল আন্দোলনকে একের পর এক কিভাবে উপস্থাপিত করেছে।

"যারা আল্লাহর নিদর্শন অবিশ্বাস করে—এবং বিনাকারণে রসূলদেরকে এবং ন্যায়পন্থীদেরকে হত্যা করে। ৩ ঃ ২১।"

আমরা লক্ষ্য করছি এ আয়াতে তিনটি পরস্পর অন্বয়যুক্ত বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর নিদর্শন, দ্বিতীয়তঃ নবীগণ এবং তৃতীয়তঃ সে সকল লোক যারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে ঐক্যের আহবান জানায়। নবীদের এবং ইনসাফের নিশানবরদারদের একই পাল্লায় রাখা

হয়েছে। আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি যে, কোরআন কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা, মানব ইতিহাসের কোন দর্শন এবং বিগত আন্দোলনসমূহের কি ধরনের বর্ণনা প্রকাশ করছে।

এ আনুগত্যের ধর্মের শেষ ঐশী বাণীবাহক হচ্ছেন ইসলামের নবী (দঃ) যে ধর্ম গোটা ইতিহাসের ধারায় পরিদৃষ্ট হয়—কোরআন যে বিষয় বার বার বর্ণনা করেছে এবং যার জন্যে নবীর (দঃ) আগমন হয়েছে। তাদের বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রজ্ঞা, এর মধ্যে রয়েছে প্রত্যাদেশ এবং দুনিয়াবাসীর জন্যে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা। ইসলামের নবী বিশ্বের শেষ পয়গম্বর এবং শেষ মানবীয় আন্দোলনকারী যিনি আনুগত্যের ( ইসলাম ) নামে জনগণকে আল্লাহর দাসত্ব করা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য ও দাসত্ব না করার জন্যে আহবান জানিয়েছেন। ইসলামের নবী এসেছেন সার্বজনীন সে ঐক্যের (তৌহিদ) বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং মানব ইতিহাসে সকল বর্ণ, জাতি, গোত্র, পরিবার ও সামাজিক শ্রেণীসমূহে সে ঐক্য বাস্তবায়নের এবং বহুত্ববাদী ধর্মাদির গরমিল দূরিভূত করার জন্যেও। ইসলামী ঐক্যের শ্লোগান হচ্ছে এমনি এক ঘোষণা যা' এনেছে মুক্তি। বুদ্ধিজীবী, বিদ্বজ্জন, শিক্ষিত এবং দার্শনিক সবাই হলেন সতর্ক। অত্যাচারিত, ক্ষুধার্ত ও অবনমিত শ্রেণী এ বিষয়ে হল অনুভূতিপ্রবণ এবং সচেতন। এ জন্যে বলছি যে, মক্কায় মুহাম্মদ ( দঃ )-এর চতুষ্পার্শ্বে যারা সমবেত হয়েছিলেন তারা সমাজের সে ছিন্নমূল অংশ যারা ছিলেন সর্বাধিক বঞ্চিত এবং যারা নিগৃহীত হয়ে আসছিলেন। ইসলামের নবী (দঃ)কে অবজ্ঞা করা হত এ জন্যে যে, অনুসারী সমাজের সর্বনিম্নস্তরের অংশটিই তাঁর আন্দোলনের অনুগামী হয়েছিলেন। অথচ আমরা দেখছি, যেমন, বৌদ্ধ ধর্মের নেতৃবৃন্দ ছিলেন চীন ও ভারতের সম্ভ্রান্তবংশ ও অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আজকে অবশ্য যে কোন আন্দোলনে নিম্নশ্রেণীর অংশগ্রহণের বিষয়টিই সর্বাধিক প্রশংসনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে, কেননা এখন মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে।

এ' জন্যে ইসলামের নবী (দঃ) তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন যারা গোটা ঐতিহাসিক সময়ে এ বদ্ধমূল ধারণাই পোষণ করত যে দাসত্ব করাই হচ্ছে তাদের ভাগ্যের লিখন। এ' সকল দাস এবং ছিন্নমূলরা ধর্মীয় বাণী, বিজ্ঞান, দর্শন বা সমাজের ভাষা কিংবা কাব্য অথবা ললিত-কলায় পরিস্ফুটিত বিষয়সমূহ হতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত

হয়েছিল যে মনিবের দাসত্ব করাই তাদের নিয়তি এবং তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, অন্যের সুখের জন্যেই ভারী বোঝাবহন এবং ক্ষুধার্ত থাকার যন্ত্রণা সহ্য করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। এ জন্যেই তাদের জন্ম, তাদের সৃষ্টি।

এ সকল বঞ্চিত শ্রেণী স্থিরনিশ্চিত ছিল যে, দেব-দেবীগণ কিংবা ঈশ্বর তাদের শত্রু, তারা বিশ্বাস করত পৃথিবীর কার্যাদি সম্পাদনের এবং মানুষের কাজকর্ম সমাধার জন্যে ভার-গ্রহণের নিমিত্তে ভারবাহক হিসেবে তাদের সৃষ্টি। প্রবর্তক মুনি আলো-আঁধার সম্বন্ধে বলেছেন, "অন্ধকার দিকটির জন্যে অনিবার্য প্রয়োজন ইতর ও বিজিত শ্রেণীর, আলোর জন্যে অত্যাবশ্যক হচ্ছে বিজয়ী অংশের।" এ্যারিস্টেটল এবং প্লেটোর মত বিজ্ঞজনরা বলেন, "স্রষ্টা বা প্রকৃতি কাউকে সৃষ্টি করেছেন দাস হিসেবে আবার কাউকে করেছেন স্বাধীন, যাতে দাসরা সাধারণ কাজগুলো সমাধা করতে পারে আর অপরপক্ষে উচ্চস্তরের কাজগুলো যথা ঃ নীতিবিদ্যা, কাব্য, সুর চর্চা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো, তখনই স্বাধীনভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে স্বাধীন মানুষের পক্ষে।

প্রতারণা, মিথ্যা, বহুত্ববাদ, অনৈক্য সৃষ্টি, আভিজাত্য ও শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদি মানব-ইতিহাসে যা এতদিন বিরাজমান ছিল তার বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব পূর্ণতায় পৌঁছবার জন্যে নবী (দঃ) কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত সব কিছু নির্দিষ্ট হয়েছিল একটা আধ্যাত্মিক আন্দোলনের লক্ষ্যে। এ জন্যে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সকল মনুষ্য সমাজ একই বর্ণ, একই উৎস, একই প্রকৃতি এবং একই আল্লাহ থেকে উদ্ভূত। দার্শনিক ব্যাখ্যাসহ এবং সামাজিক ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করে সবার জন্যে ঐক্যের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

মদীনার সে' আদর্শ-সমাজ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা য়া'ক, যেখানে ছিন্নমূল ক্রীতদাস বিলালকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে অধিকতর মহৎ ও উঁচুদরের লোক হিসেবে এবং আরবের অভিজাত-সমাজের লোকদের চেয়েও বেশী সম্মান দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁরা এ' অবস্থাকে সবাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সপ্রতিভ হলেও মদীনাবাসী, আরবের সকল মানুষ, ইয়াহুদীগণ এবং কুরাইশ গোত্রের লোকজন দেখলো পথের ছিন্নমূল

হুজাইফাকে সবাই অভিবাদন জানাচ্ছে, সমমর্যাদা দেয়া হচ্ছে তাঁকে। দেখা গেল সম্ভ্রান্ত কুরাইশের মুহাজিরদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এখন তিনি কুবা মসজিদে সালাত সম্পাদন করছেন। তিনি হলেন একজন সর্বাধিক প্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। প্রাক-ইসলামী যুগের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং সমসাময়িককালের অনেকেই তাঁর পশ্চাতে নামাজ পড়েছেন। নবী (দঃ) যখন জাহেলিয়াতের ও অভিজাততন্ত্রের চিন্তাপ্রসূত মূল্যবোধ উৎখাতের তৎপরতা শুরু করলেন, তখন পূর্বের সকল মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন নিম্নাঙ্গের পরিধেয় বস্ত্র ও জামাকাপড় খাট করতে এবং শশ্রু পরিপাটি করে রাখতে অর্থাৎ আভিজাত্যের সকল নিদর্শন মুছে ফেলতে। তিনি গর্বভরে পথ চলতে জনতাকে নিষেধ করলেন। নির্দেশ জারি করলেন একই অশ্বে একসঙ্গে দু'জন আরোহী উপবিষ্ট হওয়ার। একজন সম্মুখে অশ্ব পরিচালনা করবেন অপরজন থাকবেন পশ্চাতে। কখনো কখনো তিনি জনতার মাঝ হতে আভিজাত্য-বোধের উচ্ছেদের জন্যে গর্দভেরও মুক্ত পৃষ্ঠে সওয়ার হতেন।

একদিন একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ নবী (দঃ)-এর মহানুভবতা ও বদান্যতার বিষয় শুনে আসছিলেন, তিনি নবী (দঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। মহিলাটির নবী (দঃ)-এর উপস্থিতিতে ভক্তির আতিশয্যে বাকশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিলেন যেন। নবী (দঃ) বিনম্রভাবে, দয়ার্দ্রচিত্তে এবং খুব সহজভাবে তাঁকে ঘাড়ে উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন, "আপনি ভীত হচ্ছেন কেন? আমিত সে কুরাইশ মহিলার সন্তান যিনি তেড়ায় দুধ দোহন করতেন। কার জন্যে আপনি ভীত হচ্ছেন?"

এ' রাখাল যিনি আখেরী নবী, আখেরী পয়গাম্বর। নিস্তব্ধ মরুর বুক থেকে বিস্ময়ের মতই যার আবির্ভাব ঘটেছিল এবং যিনি নাস্তানাবুদ করেছেন ক্ষমতাদর্পী ও সম্পদশালী প্রভুদের, নগরের প্রতারকদের। মৃত্যুও হয় তাঁর অকস্মাৎ, সব ব্যাপারেই তিনি এক ব্যতিক্রম। তাঁর মৃত্যুর পর পরই শুরু হয়ে যায় বৈসাদৃশ্য। প্রথম দিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সত্য থেকে এক সেন্টিমিটারের উর্ধে বিকৃত হয়নি। প্রারম্ভে ইসলামী চিন্তাধারার ও ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে এবং সত্য ও বাস্তবের অভ্যন্তরে যে কৌণিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা' ছিল নেহায়েত স্বল্প পরিসরের। কিন্তু নবী (দঃ)-এর মৃত্যুর পর সে'গুলো ব্যাপকতর হতে

থাকে, এটা ছিল দু'টি সংযুক্ত রেখা সৃষ্টি কোণের মত যা' প্রথমতঃ একত্রে ছিল ( এক সেন্টিমিটারের সহস্রাংশের বেশী নয় ) ক্রমান্বয়ে ইতিহাসের কালাতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে এর পার্থক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দু'টি রেখার মধ্যে এমনি পার্থক্য সূচীত হয়েছে যে, কালক্রমে সেখানে অনেক অনেক কিলোমিটারের ফাঁক লক্ষ্য করা যায়।

আমরা দেখবো যে, ইতিহাস ও ইসলামী সত্যের মধ্যকার কৌণিক বিন্দু হতে সৃষ্ট রেখাদ্বয়ের দূরত্ব আরও ব্যাপকতর হবে যদি অন্যান্য কার্যকারণাদি এর সঙ্গে সক্রিয় হয়।

## বিচ্যুতির আত্মপ্রকাশ ঃ

প্রথমে যে বিচ্যুতি ছিল যৎসামান্য নবী করীম (দঃ)-এর অন্তর্ধানের পর বংশানুক্রমে সেটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্যের ক্ষেত্রেও বিচ্যুতি বেড়ে চলে। ১৪ বা ১৫ বছরের প্রান্তসীমায় এসে ওসমান (রাঃ)-কে আমরা দেখেছি যে, প্রতিবিপ্লবীদের চুম্বক-দণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন তিনি। অথচ এসব প্রতিবিপ্লবী এজেন্টরা ছিল যন্ত্রতন্ত্র বিচ্ছিন্ন। তারা ইসলামী সরকার এবং আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু কব্জা করে বসলো। এতে করে জাহেলিয়াতের যুগের মানসিকতার সঙ্গে ইসলামী বিপ্লবোত্তর মানসিকতার মধ্যে একটা অবৈধ ঐক্য গড়ে উঠলো। পরিত্যক্ত অভিজাততন্ত্র যা' তখনো সুপ্তভাবে বিরাজমান ছিল সে ঘৃণ্য জাত্যাভিমানীদের জন্যে খেলাফত রূপান্তরিত হলো লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক সেতুরূপে। মুহাজির ও আনসারদের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ফলে অর্জিত অবস্থান তারা দখল করে নিল।

এমনি করে জাহেলিয়াতের ও ইসলামের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হল এবং ওসমানী খেলাফতের সেতু দিয়ে পার হলো সর্বাধিক পুঁতিগন্ধময়, অর্ধমৃত ও পরিত্যক্ত অভিজাততন্ত্রের প্রতিভূরা। তারা মুহাজির এবং নবী (দঃ)-এর সাহাবাগণের জিহাদের ( ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ) বিনিময়ে অর্জিত স্থান জবর দখল করে নিল।

ওসমান (রাঃ) ইসলামের জঘন্যতম দুশমন উমাইয়াদের স্বার্থোদ্ধারের যন্ত্রে পরিণত হলেন, তাঁকে ব্যবহার করে ওরা নবী (দঃ)-এর সময়ে যে আঘাত পেয়েছে সেটার বদলাই গ্রহণ করেনি মাত্র বরং বিপ্লবের বিজয়ের ফলও

তারা অধিকার করে বসে। আমি যদিও এটা অনিবার্য মনে করি না এবং এটাও মনে করি না যে, একটা বিপ্লব তার সন্তানদেরকে বিচ্যুত করে, তথাপি, এটাই সত্য যে, সতসিদ্ধ-বিধানের মত এ ধরনের প্রতিবন্ধকতারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, বার বার ইসলামের ইতিহাসে। যারা ঈমান, আত্মবিসর্জন, আন্তরিকতা ও সহনশীলতা নিয়ে তরবারি ধারণ করেছেন, জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন, ক্ষমতা এবং সরকার জবর দখলকারী অত্যাচারীদের দ্বারা তারা নিশ্চিহ্ন হচ্ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হচ্ছিল জনগণের অধিকার ও বিপ্লবের ঐতিহ্য। বিপ্লবের নির্মাতা এবং হযরত ওসমান ও তাঁর উপর প্রভাব বিস্তারকারী উমাইয়াদের প্রথম বলি হচ্ছেন আলী (রাঃ) যিনি উদীয়মান প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা আইয়ামে জাহেলিয়াতের পুনরুত্থান ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন। যাঁরা সম্পূর্ণ নতুন এবং সত্যিকারের ইসলামী স্লোগান নিয়ে জাগৃতি-গান গাইতেছিলেন, যাঁরা নতুন মূল্যবোধ ও ঈমানের প্রতি ছিলেন আনুগত্যশীল, তাঁদের সঙ্গে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দের যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির কারণেই তিনি সে নতুন আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা সম্মুখীন হন জালসা এবং সে সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে, নব-উদ্দীপনা নিয়ে যারা জাহেলী যুগের শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ছিল। এ সকল জবর দখলকারীরা নবোদ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে এবং সংগোপনে ইসলামী আন্দোলনের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

রসূল (দঃ) হচ্ছেন সে যুগের নিদর্শন যখন সত্যিকারের বিশ্বাসী মুসলমানরা সে সকল বৈদেশিক শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল যারা পরিচিত ছিল মুসলিম-বিরোধী বলে। অপর পক্ষে, আলী (রাঃ) সে যুগের নিদর্শন যখন অনুগত বিশ্বাসীদের এবং ঈমানের মুখোশ পরিহিত বিপ্লব-বিরোধীদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত বেঁধেছিল।

মুহাম্মদ (দঃ) ও আবু সুফিয়ান (যিনি ছিলেন একজন সুবিধাবাদী, দলবলসহ পরাজয়ের পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন) এর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ছিল একটা প্রকাশ্য যুদ্ধ যা নির্ভেজাল ও সাধারণভাবেই মিত্র ও শত্রুর মধ্যকার লড়াই। বিপরীত পক্ষে আলী (রাঃ) ও মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব ছিল বলা উচিৎ বন্ধু ও বন্ধুত্বের ভান-গ্রহণকারী ঘরের শত্রু যে তাত্ত্বিক

দিক থেকে শুধু বিপ্লবকে মেনে নিয়েছে এ' উভয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বিদেশের ময়দানে বৈদেশিক শত্রুর সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছে সে ক্ষেত্রে বিজয় এসেছে; আর ঘরের শত্রু বিভীষণের সঙ্গে যে সংঘাত হয়েছে সেটা এনেছে পরাজয়। কোরআনের ভাষায় তথা ইসলামী পরিভাষায় একেই বলা হয়েছে "প্রবঞ্চক' (মুনাফিকীন)—এরা তাহা কাফির অথবা মুশরিক হতেও জঘন্যতর এবং অধিকতর ভয়াবহ। তাই বলা যায় রসুল (দঃ) ছিলেন এমনি এককালের নিদর্শন যখন বিদেশের ময়দানে কাট্টা কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছে। অপর পক্ষে আলী (রাঃ) হচ্ছেন ইসলামের পরাজয়কালীন নিদর্শন যে পরাজয় ঘটেছে আভ্যন্তরীণ কলহের কারণে মুনাফেকদের দ্বারা।

সত্যের মোড়কের অন্তরালে, ইনসাফকামী ইসলামী বিপ্লবের হাদপিণ্ডে যে 'নব্য জাহেলিয়াত' ও নব্য-অভিজাততন্ত্র আত্মপ্রকাশ করলো, আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন—এ জন্যে তাঁকেই বলা যাবে সে প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিত্তি। স্বধর্মের অভ্যন্তরের এ মুশরেকী যা তৌহিদী পোশাকের ছদ্মাবরণে প্রবেশ করেছিল, আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন করেছেন দীর্ঘ সময়ের জন্যে। সে সকল নাস্তিক যারা ইসলামের ছদ্মাবরণ গ্রহণ করেছিল, যারা কোরআনকে বর্শার অগ্রভাগে স্থাপন (সিফ্ফীনের যুদ্ধে) করেছিল তিনি তাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরিশেষে আলী (রাঃ) ধর্মপরায়ণ অচেতন জনতার হাতে শাহাদত বরণ করেন। যারা সবসময়ই ইসলামের সুচতুর দুশমনদের ব্যবহার্য যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আমরা যদি সময়ের দিকে এগুতে থাকি দেখতে পাব ইসলামী আন্দোলনের সত্যিকারের ভিত্তি দিন দিন দুর্বল হতে দুর্বলতর হচ্ছিল। বিপরীত পক্ষে ইমাম হাসান (রাঃ)-এর (৬৬০ খৃস্টাব্দ, ৪০ হিজরী, আলী ও ফাতিমা (রাঃ) এদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ) সময়কালের মধ্যেই নব্য-জাহেলিয়াত এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুরা শক্তিশালী হতে হতে সর্বাধিক সংহত হল।

ইমাম হাসান ছিলেন আলী (রাঃ) এর প্রশাসনের উত্তরাধিকারী এবং তিনি এমন একটি সেনাবাহিনীর প্রধান হলেন যেখানে প্রবঞ্চনা এমনি পর্যায়ে উন্নীত হল যে তাঁর নিকটতর বন্ধুদের মধ্যে তা' সংক্রমিত হয়ে পড়লো। তাঁর সবচাইতে যোগ্য সেনাপতিরাও উমাইয়াদের ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ হয়ে পড়লো

এবং অর্থ, ক্ষমতা ও অন্যান্য ওয়াদার ব্যাপারে গোপন দেন দরবারে লিপ্ত হল। দামেস্কের মানবতা ও মর্যাদা ক্ষয়কারী মুয়াবিয়ার নিকট এবং তার দরবারে আত্মবিক্রয়ের জন্যে ও' সকল কর্মচারীরা দর কষাকষি শুরু করলো। ইসলামী ভূ-খণ্ডের এ' অন্যতম শক্তিশালী ভয়ানক ও আবেগপ্রবণ অংশের (সিরিয়া প্রদেশ) ওপর প্রশাসনিক দিক থেকে হাসান (রাঃ) এর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ইরাকে চলছিল নানা উপদলীয় কোন্দল। অভিজাত শ্রেণী কখনো আলীর শাসনের প্রতি আনুগত্যশীল হতে পারে না। জনসাধারণ ছিল অবহেলিত এবং শতধাবিভক্ত।

নব্য ইসলামী আন্দোলনের সবচাইতে প্রিয়, সর্বাধিক সচেতন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিবাদী সর্বশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী যুদ্ধা ইমাম হাসানের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো সে সকল খারিজীরা যারা ছিল গোঁড়া ও ধর্মান্ধ এবং জনতার মাঝে যারা মারাত্মক ক্ষতিকর শক্তি হিসেবে বিরাজ করত। অভিজাত ইসলামের করাল গ্রাস থেকে ইনসাফপূর্ণ ইসলামকে রক্ষার নিমিত্তে যে হাদয় বিদারক ও সর্বনাশা শেষ সংগ্রাম সংঘটিত হয় তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঘরোয়া শত্রুদের প্রতারণার জাল বৃদ্ধি পেয়েই চলছিল। তখন বিকল্প পথ ছিল সন্ধি করা। তিনি পরাজিত হলেন। পরাজিত পক্ষ চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণ করতে পারে না। তাঁর ওপর শর্তাবলী চাপিয়ে দেয়া হলো। ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

এভাবে বিপ্লবের নেতা, সংগ্রামী চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইমাম হাসান নতুন গজিয়ে উঠা জাহেলিয়াতের চাপে নিষ্ক্রিয় হলেন। একজন সাধারণ সৈনিকের মত তাঁকে অস্ত্রহীন করা হলো। স্বদল ত্যাগী ও উমাইয়াদের নিয়োজিত গুপ্তচরদের সদা সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে তিনি হলেন নজরবন্দী। এক পাতে যে খেত সেও পরিণত হল দুশমনে। এমনকি তারা তাঁর স্ত্রীকেও ক্রয় করলো এবং তার সহায়তায় তাঁকে বিষপান করাল। এ থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাধীনতা এবং জনতার চারিত্রিক অধঃপতন কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। এটি এমনি এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ইমাম হাসানের শক্তি-সাহস ও শক্তিশালী নেতৃত্বে ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ার এবং ইসলামকে রক্ষা করার চেষ্টাসমূহের বিষয় তখন জলন্ত তথাপি তাঁকে এমনিভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছিল যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হলো মদীনায় তাঁকে কবরস্থ করা যাবে না। অথচ এটা হচ্ছে তাঁর মাতামহের শহর। মুহাজের ও ইসলামের নবী (দঃ)-কে সাহায্যকারীদের শহর।

কিন্তু ইমাম হাসান কবরস্থ হলেন জান্নাতুল বাকীর সাধারণ কবরগাহে। ইমাম হাসান যিনি একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতার উদাহরণ—মদীনাতেও তিনি এমনি ছিলেন—তাঁর অবস্থা ইসলামের সত্যানুসন্ধিৎসু দলটির দুঃসহ বিচ্ছিন্নতার বিষয়টিই প্রকটিত করে তুলে। বিপ্লবের নতুন শক্তির কাছে সবাই, সবকিছু ভেসে যায় এবং সে শক্তিই সকল ভূখণ্ডে জয়ী হয়। এবার হোসাইনের পালা।

## ইমাম হোসাইন

হোসাইন (রাঃ) ইসলামী আন্দোলনেরই উত্তরসূরী। মুহাম্মদ (দঃ) যে আন্দোলন শুরু করেছেন, আলী (রাঃ) যার স্থায়ীত্ব বাড়িয়েছেন এবং যা' রক্ষা করার জন্যে ইমাম হাসান শেষ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছেন ইমাম হোসাইন সে আন্দোলনেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু এখন উত্তরাধিকার সূত্রে হোসাইনের জন্যে না আছে কোন সেনাবাহিনী, না কোন অস্ত্রশস্ত্র, না কোন সম্পদ, ক্ষমতা বা শক্তি; এমন কি একদল সুসংগঠিত অনুসারীও। কিছুই না।

এটা ৬০ হিজরীর কাছাকাছি (৬০০ খৃষ্টাব্দ), নবী (দঃ)-এর ওফাতের পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হয়েছে। প্রত্যেক ইমাম নিজস্ব আন্দোলনের রূপরেখা পছন্দ করেন। (দয়া করে এখন থেকে আমি যা কিছু বলতে যাচ্ছি সে বিষয় বিশেষ মনোযোগ দেবেন। কেননা এখান থেকে আমি প্রধান আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করছি।)

হোসাইন (রাঃ) যে ঘটনার প্রেক্ষিতে তার প্রতিবাদী সংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছিলেন সেটা বিবেচনা না করে তার গৃহীত সংগ্রামের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। এখন, যখন হোসাইনের পালা এল, জনগণ এবং সমগ্র তখন একজনের জন্যে প্রত্যাশী ছিল। যখন একটা জাতির ভাগ্য, একটা বিশ্বাসের ভাগ্য, একটা চিন্তাধারা, একটা সমাজ, একটা জনগোষ্ঠী এক বা একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে হেদায়েত লাভের প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করে, কত কঠিনই না সে সময়! প্রতিরোধের শেষ প্রাচীরটিও যখন ধ্বংস হলো তখনই বিপ্লব রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হলো হোসাইন (রাঃ) এর স্কন্ধে। তাঁর মাতামহ, পিতা, ভ্রাতা, ইসলামী সরকার অথবা সত্যানুসারী ন্যায়পন্থী অংশ, কোন শক্তিই তাঁকে সাহায্য করার ছিল না—না ছিল তরবারি, না ছিল সৈন্য।

সমাজের প্রতিটি ভিত্তিমূলেই উমাইয়াদের দখলে ছিল। বহুরের পর বছর কুরাইশরা তাদের নব্য-জাহেলিয়াতের সমন্বয়কালে মূল্যবোধের বিকৃতি ঘটিয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের ফলকে লুটে পুটে খেয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামী বিপ্লবের এককেন্দ্রিমুখীতার গুণ বিলুপ্ত হলো এবং সাহাবারা ও প্রথম যুগের বিপ্লবীরা তথা নবীর চিন্তাধারার অনুসারীরা তিনটি ভাগে বিভক্ত হলো।

– প্রথম দল যারা বিপ্লবের মধ্যে বিচ্যুতি ঘটানোর বিরোধী ছিলেন এবং ৬০ হিজরীতে এ জন্যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছিলেন তাঁরা সবাই ইহধাম ত্যাগ করলেন। আবু জর, আম্মার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ, মিহাম, হাজর ইবনে আদী, সবাই চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দলটি হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ কোণঠাসা। চরম সংকটের দিনে যখন প্রয়োজন ছিল আত্মোৎসর্গের এবাদত, তখন এরা নিবেদিত হলো নামাজ এবং যোগ-সাধনার মধ্যে। সত্যিকারের মুসলমানরাও না বিজয়ের জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে পারলেন, না শাহাদত বরণের সুযোগ হলো তাঁদের বরং জিন্দানখানায় নিপীড়িত জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছিল তাঁদের অনেককেই। আবার অনেকেই ভিন্ন পথ ধরলেন। জিহাদের পথে বেহেশত না খুঁজে তাঁরা গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করলেন যোগ সাধনার শান্ত জীবনের প্রতি; তাঁরা নিয়োজিত হলো প্রভু প্রেমের আরাধনার মাঝে। দীর্ঘদিনের রোজা এবং আত্ম-নিপীড়ন ও নফল নামাজাদি সম্পাদনের মাধ্যমে পরকালের সফলতা লাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলো তাঁরা। এ দলটির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর।

উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীর বরকান্দাজদের চাবুকের আঘাতে যখন মুসলিম জনতা জর্জরিত, তাদের তরবারির আঘাতে যখন মুসলমানদের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হচ্ছিল, জনতা তখন ইসলামী আন্দোলনী পরিবেশে লালিত যাঁরা রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছেন সে সকল মহান ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে একটা অভ্যুত্থান, একটা প্রতিরোধ কামনা করছিল। সে মুহূর্তে যখন তাঁদের আধ্যাত্মিক বিদ্রোহ করা কর্তব্য ছিল, তাঁরা তা করতে পারলেন না বরং নিজেদেরকে মসজিদের কোণে গুটিয়ে কৃচ্ছ্র সাধনায় লিপ্ত হলেন।

কারা উত্তম মুসলিম ব্যক্তিত্ব যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁরা না সে সকল ভক্ত যাঁরা অত্যাচার আর বেঈমানীর প্রতিভূদের ভয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন?

তারাই কি, যারা সে সংকটাপন্ন সময়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের ময়দান পরিত্যাগ করে হামাগুড়ি দিয়ে সমাজ থেকে দূরে মসজিদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন ? ... তাঁদের এ পলায়নপর মনোবৃত্তি তাদের হস্তসমূহকে কি করেনি কলুষিত, অপরাধী ? পূর্ণাত্মা বীরদের রক্তে কলঙ্কিত নয় কি এ সকল হাড় ? নিজেদের রুধীর ধারার কাছেও কি এরা ঋণী নয় ?

সচেতন ব্যক্তিরা হক ও বাতিলের পার্থক্য করে এবং এ প্রসংগে তাঁর দায়িত্ব কি সেটাও অনুভব করে। কিন্তু যদি সে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে নির্জন সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তবে তার এ কাজ সে সকল স্বাধীনচেতা, সচেতন মুজাহীদদেরকে ( যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে ) অত্যাচারীর বলিকাষ্ঠে ঠেলে দেয়ার সহায়তারই নামান্তর হবে। তাঁকেও আত্মবলি দিতে হতে পারে। সে এমন এক অপরাধী যে স্বার্থহীনভাবেই হোক কিংবা অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়েই হোক অপরাধ করছে। সে ঈমানদারীর প্রকৃষ্টতম নিশানবরদারদেরকে বিসর্জন দিচ্ছে বেঈমানদের স্বার্থে। এরা হচ্ছেন জঘন্যতম অংশ। এরা জালেমের পদতলে আত্মহত্যা করেছে।

তৃতীয় দলটি সে' সকল সাহাবাদের যাঁরা সজ্ঞানে জিহাদের ময়দান পরিহার করেছে। এরা সে' অংশ যারা বদর, ওহুদ, খন্দকের যুদ্ধ, মদীনার অন্যান্য সংগ্রামে হিজরতের সময় নবী (দঃ) এর পাশে পাশে ছিলেন। এরা মুয়াবিয়ার সবুজ প্রাসাদের চত্বরে দাঁড়িয়ে সব আত্মসম্মানবোধ বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। তাঁরা সামান্য দিনারের বিনিময়ে নবী (দঃ)-এর হাদীসকে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনে করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

এমনি যখন অবস্থা তখন যুবসমাজ কি ভাবতে পারে বলে আপনাদের বিশ্বাস ? এটাই হচ্ছে হোসাইনের সমরকাল। এটা বিপ্লবের মাত্র এক পুরুষ পরের বংশধরদের ঘটনা যারা সে স্বর্ণযুগ, সে অতুলনীয় বিজয়ের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি, দেখেনি সাহাবাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভালবাসার বিস্ময়। বিপ্লবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবাদের ঘিরেই তাদের আশা-আকাংখা, বিশ্বাস এবং চিন্তা-ভাবনা সবকিছুই কেন্দ্রীভূত ছিল।

যখন প্রতিদিন তারা দেখতো যে এক এক করে তাদের বীর সংগ্রামীদের বিচ্যুতি ঘটছে, কতই না হতাশাব্যঞ্জক সে পরিস্থিতি, ইসলামী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন মারাত্মক অবক্ষয়ই না ডেকে আনছিল সে ঘটনাবলী। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, বিগত যুগের নবী (দঃ) এর যুগের তথা বিপ্লবকালের

সাহাবাদের অনেককেই এমনি পরিণতির সম্মুখীন হতে হলো। ইসলামী বিপ্লবোত্তর দ্বিতীয় যুগের বংশধরগণের মধ্যে যারা গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জিহাদী কুয়ত নিয়ে নব্য জাহেলিয়তের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন এদের মধ্যে যারা অগ্রণী, পূর্ব অভিজ্ঞতা থাক আর না-ই থাক সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কম-বেশী সবাই ওয়াকেফহাল ছিলেন। এ' দ্বিতীয় যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছেন হাজর ইবনে আদী। নবী (দঃ) এর জীবদ্দশায় হাজর ছিলেন একজন কিশোর মাত্র। আলীর শাসনামলে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এর পর তিনি পৌঁছেন হাসানের সমকালে। তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলী। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সচেতন মুজাহিদ ছিলেন তিনি। ইমাম হাসান এবং আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি প্রসংগে হাসান কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টির তিনি ছিলেন নীতিগতভাবে ঘোর বিরোধী। তিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, ইমাম হাসানকে এ বলে ভৎর্সনা করতেও কুণ্ঠিত হননি : "এ কাজটি করে বাস্তবিকপক্ষেই আপনি জনতাকে অপমান করেছেন।"

জিহাদী জোশে উদ্দীপ্ত অকুতোভয় বিপ্লবী ছিলেন তিনি। ইমাম হাসান তাঁকে মদীনায় ডেকে এনে বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের ব্যাপারে সম্মত করালেন, শুনালেন বিপ্লবের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা।

ইতিহাসে তাঁদের মধ্যকার সে কথোপকথনের বিষয়টি স্পষ্টতঃ উল্লেখিত হয়নি। মোটামুটি আমরা বুঝি যে, হাজর আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের নিশ্চিত ধারণা নিয়েই ফিরে এসেছিলেন। হাজর সহজে বুঝবার কিংবা আপোসকামী সংরক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন লোক ছিলেন না। অযৌক্তিক কথা মানা বা বাহ্যিক সহনশীলতা কিংবা শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের পথ গ্রহণ করার মত ছিল না তাঁর প্রকৃতি। নেতৃত্বের প্রতি তিনি এমনি আজ্ঞাবহও ছিলেন না যে, প্রশ্ন ছাড়াই তিনি ইমাম হাসানের মতামতকে মেনে নিতে পারেন।

হাজরের সঙ্গে ইমাম হাসান এবং ইমামের সঙ্গে অপর এক প্রতিরোধ-বিপ্লবী সুলাইমান-ইবনে-ছুরাদ-ই-খাজাই-এর পারস্পরিক আলোচনার বিষয় উল্লেখ করেছেন মিসরের বিখ্যাত লেখক তাহা হুসাইন। তাঁর মতে হাজরের মত সুলাইমানও ছিলেন সৌহার্দ্যময় শান্তিময় আপোসের বিরোধী, কিন্তু তিনি হাসানের যুক্তিবাদিতার দ্বারা তৃপ্ত হয়ে ফিরে এলেন। তাহা হোসাইন

বলেন যে, সম্ভবতঃ ইমাম হোসাইনের যুক্তি ছিল নিম্নরূপ ঃ যে কোন প্রকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ যথা সৈন্যবাহিনীসহ জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া ফলদায়ক কিছু হবে না বরং অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকেই ধ্বংস করবে। তিনি তাঁদেরকে একটি গোপন সক্রিয় সংগঠন কায়েমের অভিপ্রায়ে ভিত্তিমূল স্থাপনের কথা বলেছিলেন যা গোপনে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। জালিমশাহীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন তথা বিপ্লবী পদক্ষেপ শুরু হল। এটা হচ্ছে সে' সংগঠন যা' দু'জন উমাইয়া খলিফা এবং আব্বাসিয়া শাসন আমল অতিক্রম করে এ পর্যায়ের শেষ শিয়া ইমামের সময়কাল পর্যন্ত অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে ভীত্তিভূমি তৈরী করছিল যা' পরবর্তী পর্যায়ে সারা ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিয়া প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে। হাজর এবং আলী ইবনে হাত্তামের মত তাঁর অন্যান্য সাথীরা ছিলেন দুর্দমনীয় শক্তির অধিকারী যাঁরা কখনই জনগণের ওপর চেপে বসা তঁদের অধিকার হরণকারীর অবদমন, স্বৈরাচার ও শোষণের হোতা নিপীড়নকারী জাহেল একনায়কত্বের প্রতিভূদের শাসনকাল কিছুতেই সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। মানবতাবোধ ও ইসলামী আদর্শের এ' বিপর্যস্ত অবস্থাকেও তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না। জনগণের অধিকার, ন্যায় বিচার ও ইসলামকে বিক্রয়কারী বিচ্যুৎ শাসন ব্যবস্থা যা দিন দিন সংহত হতে যাচ্ছিল তাঁরা সে' শাসনের বিরুদ্ধাচারণের জন্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন।

হাজরের নেতৃত্বে এ' সংগ্রাম প্রবলতর হতে থাকে। উমাইয়াদের এক ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁকে নাস্তিক বলে হেয় প্রতিপন্ন করে যখন এক ফতোয়া জারি (উমাইয়াদের পছন্দমতই এটা করা হয়েছে!) করা হল এ' সময়ের পূর্বে তাঁর আন্দোলন পৌঁছেছিল উত্তুঙ্গে। এরপর খেলাফতোত্তর জামানার এ সকল তরুণ অতুলনীয় বীরত্বের অধিকারী বিপ্লব রক্ষাকারী সংগ্রামীরা যারা আদর্শানুবর্তী ও আলী প্রদর্শিত পথের বিশ্বস্ত অনুসারী তাদেরকে দামেস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয় এবং সিরিয়ায় হত্যা করা হয়। তাঁরা অবশ্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন।

এমনি মুহূর্তে হোসাইন (রাঃ) দৃশ্যে এলেন যখন বিপ্লবের কেন্দ্রীয় শক্তি নিশ্চিহ্ন। প্রতিরোধ সংগ্রামী সাথীরা হয় শাহাদতপ্রাপ্ত হয়েছেন, নয় নির্জীব হয়ে পড়েছেন। বিশ্বস্ত সাহাবারা যারা আত্মবিক্রয় করতে পারেননি তাঁরা জনতাকে নির্যাতিত দুর্ভাগা জিন্দিগানীর হাত থেকে মুক্ত করার

অভিপ্রায়ে সত্যের জন্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝুঁকি গ্রহণ করতো এ' জন্যেই তারা নিজেদের খোদাপ্রেম ও আন্তরিকতা ভিন্ন পথে প্রবাহিত করেন। মর্যাদাবোধ, ধার্মিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতার আঁধার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁরা নির্জীব হয়ে পড়লেন। ইসলামের দ্বিতীয় যুগের বংশধররা যখন তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন এবং পরাজয় বরণ করেছিলেন তখনও নবী (দঃ)-এর অনেক উল্লেখযোগ্য অনুরক্তই মুয়াবিয়ার সবুজ প্রাসাদে দেন-দরবার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, গ্রহণ করছিলেন মুয়াবিয়ার বায়তুল মাল থেকে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য। অসি, অর্থ, পদ দ্বারা হোক কিংবা প্রতারণার মাধ্যমেই হোক, প্রত্যেকের মুখ বন্ধ করে দেয়া হলো।

ধোঁকাবাজির এ' নয়া কৌশল তথা ভীতি প্রদর্শন, চাপ সৃষ্টি, অর্থ প্রদান, প্রতারণা এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান যথারীতি চলতে থাকে। চলতে থাকে দুর্নীতি, আদর্শবোধ ও নৈতিকতার অবদমন এবং দায়িত্ববোধের হনন—যাকে বলা যেতে পারে, "নিপীড়নের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার নিপীড়ন"। এ' শাসকগোষ্ঠী এমনিভাবে সামাজিক, নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ফেললো। তারা ইসলামের মূল ভিত্তি, যথার্থ ঈমান, বিপ্লব, বিপ্লবের বুনিয়াদ এবং ইসলামের প্রতি আঘাত হানলো, এসব কিছু ধ্বংস করলো। শান্তিময় পথের ধূর্ত আহবান রেখে অন্তর ও মনের দিক থেকে হয়ে পড়লো তারা স্থবির, বন্ধ্যা, চলৎশক্তিহীন।

নব্য জাহেলিয়াতের প্রতিভূ এ ক্ষমতাসীনরা স্পষ্টতঃই বুঝতো মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরিবার, আলী (রাঃ)-এর হত্যা, হাসানের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা কিংবা হাসানকে গোপন ও অমানুষিক হত্যার দ্বারা বিপ্লবের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা যাবে না, এরা জানতো প্রতিরোধের মূল ভিত্তি ধ্বংস করা, অজাত বিপ্লবী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, দ্বিতীয় বংশধরদের মধ্যে হাজরের মত ভয়ানক শক্তিধর প্রতিরোধ বিপ্লবীদের যেমন কুফাতে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে কিংবা নির্বাসন দেয়া হয়েছে তেমন কোন পদক্ষেপ, দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেয়া, অথবা সে' সকল অধিকার যা' প্রতিষ্ঠার জন্যে হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)-এর মত সাহাবারা বিশ্বাসীদের শাসনামলে সংগ্রাম করেছেন তা' খর্ব করা ইত্যাদি কোন কিছুই কার্যকরী কোন পন্থা নয়। উমাইয়া শাসকচক্রের পশু-শক্তির আক্রমণাত্মক তৎপরতা,

গোপন হত্যাযজ্ঞ, ইনসাফ বিরোধী কর্মাদি, ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপ্তি, জাগৃতির চেতনা, সত্য বিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ধার, ইসলামী শক্তি থেকে উৎসারিত মহান চিন্তা-ভাবনা এবং নবী (দঃ)-এর মিশনের প্রকৃত অর্থ কোন কিছুই কুহেলিকাচ্ছন্ন করতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের মত যারা অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অত্যাচারিত হয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের পন্থা, ন্যায়ের সংগ্রামীদের সকল বাধার উৎখাত, শাসকগোষ্ঠীদের গৃহীত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণকারী শক্তিধর অংশের মূলোৎপাটন, একত্রে সকল আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের শাহাদত এবং ভবিষ্যত সম্ভাব্য আন্দোলনকারীদের বলপূর্বক দূরে সরিয়ে রাখা এ'গুলো কোনটাই ফলপ্রসূ কিছু নয়। সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং প্রতিভাধরদেরকেই তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, কঠোর হস্তে সকল তৎপরতা বন্ধ করেছে, যুদ্ধের সকল ময়দানে বিজয়ী হয়ে সিরিয়া থেকে খোরাসান পর্যন্ত ইসলামী ভূখণ্ডের সর্বত্র উমাইয়া রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এ'গুলো বর্তমান সত্ত্বেও প্রতিরোধ তৎপরতা উৎপাটিত করা যায়নি। যাক তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার স্থায়ীত্ব এবং স্বাধীনভাবে শাসন করার জন্যে যত সুযোগ অন্বেষণ করুক না কেন এতসব বিজয়, আধিপত্য লাভ, ইমামের শাসনের উচ্ছেদ, গণমুক্তি মোর্চাকে নিষ্পিষ্ট করা, সত্য রক্ষার আন্দোলনের সংগ্রামীদের বিচ্ছিন্ন করা কিংবা নিশ্চিহ্ন করা, স্বাধীনতাপ্রিয় সত্যান্বেষীদের ধ্বংস করা, ন্যায়বিচার-ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করা, বিরাট সেনাবাহিনীর মালিক হওয়া, বর্ম, অস্ত্রাদি, ইসলামের আচ্ছাদনে আবৃত তেজী ঘোড়া, আধিপত্যের কশাঘাতের মধ্যে জনতাকে ঠেলে দেয়া—এরূপ কোন কাজই সহায়ক নয়।

উমাইয়াদের বুদ্ধিমান সচেতন রাজনীতিকবৃন্দ নিজে অবস্থা ভালভাবেই অবগত ছিলেন। জনতার মানসিকতা এবং সময়ের দাবী সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তারা। বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মাত্র এক যুগ পরবর্তীকালের সমাজ ছিল এটি। এক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাহেলিয়াত, বহুত্ববাদ এবং বদর, ওহুদ, খন্দক যুদ্ধ কিংবা নাস্তিকবাদী, মূর্তিপূজারী, দাস ব্যবসায়ী এবং ধনতন্ত্রবাদী উপদলীয় নেতৃত্ব যারা নবী (দঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এ সকল ঘটনা এবং ঘটনাকারীদের যুগেরই পরবর্তী যুগ এটি।

উমাইয়া শাসকরা জানে যে কাল ছাইয়ের অন্তরালে চাপা পড়ে আছে লালাভ জীবন্ত শিখার ভীতি যা' শক্তিশালী বিস্ফোরকে পরিণত হতে পারে। সত্যের সৈনিক না পরাজিত হতে পারে কিন্তু ইসলাম আজও বড়ই প্রাণবন্ত। বিশ্বাসের পক্ষাবলম্বনকারী দল অন্তর্হিত হয়েছে কিন্তু বিশ্বাস নিজে আছে যথেষ্ট জীবন বেগসম্পন্ন। ন্যায় ও সত্যের নিশানবরদার নেতৃবৃন্দ মুজাহিদগণ, স্বাধীনতা ও মানবতার যারা বর্ম সবাই পরকালে প্রস্থান করেছেন। স্বাধীনতাকামীদের রচিত প্রতিবন্ধকতা নির্মূল হয়েছে, নির্মূল হয়েছে প্রতিরোধের ভিত্তিও।

কিন্তু কোথায় যাবে ইনসাফ, সত্য সাধনা, স্বাধীনতার স্বাদ এবং মানবতার প্রতি প্রেম? নামাজরত অবস্থায় আলী (রাঃ) অস্ত্রাঘাতে নিহত হলেন, কিন্তু আলী (রাঃ)-এর ঈমানী আগুনের কি হবে? নির্বাসিত আবুজর রাবা জাহতে নিহত হয়ে হলেন নিস্তব্ধ, কিন্তু তাঁর আত্মচিৎকার যা' প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে তা' প্রতিহত করবে কে? সিরিয়াতে হাজরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হয়েছে কিন্তু হাজরের বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া বন্ধ করবে কে?

এ' সকল মহাবিপদের তথা বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র মদীনায় নয় কেননা সেখানকার জনতা বিধ্বস্ত, নয় তা' কা'বাতে যেখানে গণমানুষ স্তম্ভিত, কুফাতে সেটা নয় কেননা সে স্থানটি জবর ক্ষমতা দখলকারীদের করায়ত্তে, মসজিদে নববীতেও সে' কেন্দ্র নয় কেননা সেখানে মানুষ অশ্বের পদতলে দলিত এবং অশ্বারোহীদের তরবারির আঘাতে তাদের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড, নবীর ঘরেও সেটা নয় কেননা সেটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলছে, ফাতিমার ঘরেও তা' নয় কেননা সেটা ভস্মীভূত, সে' কোরআনেও নয় যা' তারা বর্শাফলকে বিদ্ধ করেছিল—তবে সে' অগ্নির প্রাণকেন্দ্র কোথায়, কোথায় সে' বিপদের কল্যাণময় ফল্গুধারা?

এটা তাঁদের অন্তর এবং মনে। যদি এ' উভয় উৎস ধ্বংস না হয় সকল বিজয় অর্থহীন এবং সকল ক্ষমতাই হুমকির সম্মুখীন। এ' দুটি যদি প্রাণময় থাকে তবে আবুজর, হাজর, ওমর এবং মালেকও তাঁদের শাহাদতের মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন এবং ময়দানে নতুন যোদ্ধা পাঠাবেন। সকল আলীরা মৃত্যুর পূর্বে শাহাদতপ্রাপ্ত হবেন এবং অনন্ত জীবনের মধ্যে হবেন অন্তর্হিত। আদর্শের এ' চেতনা, এ' আগুন যদি নির্বাপিত করা না

যায় আঁধার ও আলোর মধ্যে কোন সৌহার্দ্য হতে পারে না—গণহত্যাকারীরা তা' সম্ভব করতে পারে না। রক্তের সাগর এবং মৃতের কবরগাহ রচনা করেও তারা মুহূর্তের জন্যে নিরাপদ হতে পারে না। ঐশী বিপ্লবের লক্ষ্যস্থল কোরআন নয় বরং অন্তরের অন্তঃস্থল বা মনের মনিকোঠা। কুফার মসজিদে শাহাদতপ্রাপ্ত হলেও আলী (রাঃ) এখনো বেঁচে আছেন। সত্য, মুক্তি ও ন্যায়বিচারের পতাকাবাহীরা সবাই নিহত হয়েছেন, সকল স্থান বিজিত সকল ময়দান পরাভূত এবং সকল অস্ত্র ও দুর্গ হস্তচ্যুত ও দখলকৃত হয়েছে। তথাপি সত্য, মুক্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অদ্যাবধি চলছে এবং উল্লেখিত দুটি কেন্দ্রকে ভিত্তি করেই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ' দু'টি কেন্দ্রকেই ধ্বংস করতে হবে। যদি এ' দ্বিবিধ অগ্নি উদ্গীরণকারী উজ্জ্বল ক্ষমতাধর বিপ্লব-জন্মের কেন্দ্র ধ্বংস হয় তবেই আঁধার টিকে থাকতে পারে, পেতে পারে আশ্রয়। শুরু হলো আক্রমণ। এ' দু'টি ভিত্তি, বিস্ফোরণ ও অগ্নির উৎস দু'টি তথা অন্তর ও মনকে ধ্বংস করার জন্যে অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে।

কিন্তু এ' যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজন অন্য এক ধরনের সৈন্যবাহিনী; বর্ম, বর্শা ও ধনুক,, পন্থা-পরিকল্পনা, শাসক এবং বিজেতা। এ' সেনাবাহিনী ও আক্রমণ পরিচালনার জন্যে না স্বর্ণ, নারী বা ইরাকের শাসন ক্ষমতা প্রদান, কিংবা কোন কূটকৌশল, আমরের প্রতিভা, অথবা বার্ণার ইবনে আরতাত, ইয়াজিদ ইবনে মহলাব এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হত্যাকাণ্ড...কোন কিছুই কার্যকরী নয়।

এ' বিস্ময়কর আক্রমণে কোরআন হচ্ছে অস্ত্র, নবীর সুন্নাহ হচ্ছে বর্ম। চিন্তাশক্তি ও বিজ্ঞান এর অস্ত্র, ঈমান এর দুর্গ, ইসলাম হচ্ছে প্রতীক, এবং মুফাচ্ছির, জ্ঞানী, বক্তা, ধর্মশাস্ত্রবিদ, বিদ্বজ্জন, বিচারক এবং নেতৃবৃন্দ সবাই এ' সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন নবী (দঃ)-এর প্রখ্যাত সাহাবাগণ; গুরুত্বপূর্ণ সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিখ্যাত মুফতিগণ।

আক্রমণ আরম্ভ হলো। আদর্শবাদী সংগ্রামী বাহিনী যদিও অপ্রতিহত গতিতে সফলজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এর বহু পূর্বেই সে ভূ-খণ্ডে পার্থিব ক্ষমতাধর সরকারী বাহিনী সফলতা অর্জন করেছে এবং সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধ করেছে। এক্ষণে তারা বিপ্লবের দু'টি কেন্দ্রে প্রবেশ, প্রভাব বিস্তার এবং অগ্রগতি লাভের চেষ্টা অব্যাহত রাখলো। ধী.র

ধীরে তারা সে দু'টিকে দখল করে নিল এবং কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বিপজ্জনক মিশ্রণ প্রয়োগের মাধ্যমে ভেতর থেকে ধ্বংস করল সেটি। তারা এমন এক মোহনী শক্তিসম্পন্ন সুরা ব্যবহার করেছে যা সকল আল্লাহ-নিষ্ঠ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বেরই জানা। তারা এর প্রস্তুত প্রণালী সারা ঐতিহাসিক সময়ে একের পর এক হস্তান্তর করে চলছে। এটা সে একই অশুভ মদ যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে ফেরাউন ও কারূণকে ধ্বংসের লক্ষ্যে মুসাকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে হয়েছিল। ঐ সর্বগ্রাসী উদ্দীপক পানীয় দিয়েই ইয়াহুদীদেরকে পরিণত করা হয়েছে ফেরাউনের চেয়েও অধিকতর খুনী, কারূণের চেয়েও বৃহত্তর অর্থগৃধ্নু, বালামের চেয়েও বড় প্রবঞ্চক। শান্তির প্রবক্তা ও স্থপতি যিশু খৃষ্টের অনুরক্ত সীজারকেও এ' কাল-মদের আসক্তি-ই বানিয়েছে ইবলিসী কর্মকাণ্ডের হোতা এবং তার মধ্যে পয়দা করেছে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞাবোধের।

আত্মবিক্রয় করল বুদ্ধিজীবীরা। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্ক স্থাপন করল ক্ষমতাধরদের সঙ্গে। ইসলামের যে কোন পরিবর্তন সব কিছুর ভাগ্যই পরিবর্তন করে দেয়। সকল মূল্যবোধ ধ্বংস করা হল। তারা ইসলামের চেতনায় বিলুপ্তি ঘটাল, ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য ভিন্ন পথে প্রবাহিত করল এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মেকী ধর্মের বেদীতে বলি দিল জনতা-সাধারণকে।

এটাই হচ্ছে এমন একটি সময় যখন থেকে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ জায়েজ করে নেয়ার রেওয়াজ প্রচলিত হল। বাধ্যবাধকতার কারণেই ধর্মবিশারদগণ সব ব্যাপারেই খোদাকে জড়িত করে। দু'টি মারাত্মক ক্যান্সার বীজ যা জনতার মাঝে বদ্ধমূল হল তা হচ্ছে—"আল্লাহর নামে" এবং "আল্লাহর জন্যে।"

প্রথমটা হচ্ছে ধর্মবিশারদগণের আভ্যন্তরীণ ক্যান্সার। তারা হচ্ছে ইসলামের নকল বিশেষজ্ঞ এবং উলামাবৃন্দ। তাঁরা হচ্ছেন ওয়ায়েজ, ইসলামী বিশারদ এবং সমাজের নেতৃবৃন্দ। সরকারী কার্যালয়ে, তাঁদের কোন কর্তৃত্ব নেই, নেই কোন অবস্থান। তাঁরা নয় হত্যাকারী। তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোণে বসে অধ্যয়ন করে, শিখেন এবং শিখান। কারা ধর্মীয় কর্তৃত্বের (মার্জা) অধিকারী?

তাঁদের মতবাদ হচ্ছে, পাপী হোক অথবা নিষ্কলুষ হোক, কেউ যদি অন্যায় করে থাকে, করে থাকে প্রতারণামূলক কর্ম, অথবা করে ষড়যন্ত্র বা

অপরাধ অবশ্যই তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মার্জনা লাভের আশা রয়েছে। এ জন্যে সে তা' আশা করতে পারে যে প্রভু বলছেন, "এমন লোকেরাও আছেন যারা খোদার নির্দেশ (ক্ষমার) লাভের প্রত্যাশা করছে।" আল্লাহর এ ধরনের আশাই সস্তা মার্জনা, অনুকম্পা এবং করুণা লাভের ধারণার জন্ম দেয়। আল্লাহ মার্জনা করেন, তিনি যে সকল ধরনের গুনা মাফ করে দিবেন তার সম্ভাবনা আছে। তাই যখন মার্জনার পথ প্রশস্ত সে ক্ষেত্রে কোন স্বাভাবিক মানুষকে অপরাধী ধরনের কোন দুর্নাম দেয়াটাই পাপ। আপনি তাদের অপমানজনক কোন নাম দিতে পারেন না, পারেন না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

বিপরীত পক্ষে যখন আপনি কাউকে অপরাধী বলে সম্বোধন করেন বা তাকে ডাকেন অত্যাচারী ও ষড়যন্ত্রকারী বলে এবং তাকে ভর্ৎসনা করেন অথবা কাউকে যদি নিপীড়িত বা দাস বলে উপাধী দেন, আপনি যেন আসলে খোদায়ী দাবী করছেন। কেননা প্রভুই হচ্ছেন প্রধান নির্দেশদাতা এবং তার নির্দেশের ভিত্তিতে সব কিছুর হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে এবং তিনি প্রত্যেকের গৃহীত কার্যপ্রণালী এবং আচরণ ইনসাফের মানদণ্ডে যাচাই করবেন। সুতরাং কোন অধিকার নেই আপনার নিপীড়নকারী ও ষড়যন্ত্রকারীর কার্যাদি যাচাইয়ের। আপনি চাচ্ছেন এখানে বিচারের মিজান বা পাল্লা স্থাপন করতে! আপনি কি খোদা? আপনি কি মানব সন্তানকে অপরাধী বানাতে চান এবং আল্লাহ কর্তৃক হিসেব-নিকেশ গ্রহণের পূর্বে নিজেই সে হিসাবের কাজ সমাপ্ত করতে চান? না। ষড়যন্ত্রকারী ও বান্দার কর্মাদির মূল্যায়নপূর্বক বিচার করার দায়িত্ব আমাদের নয়। অপরাধীকে দণ্ড দেয়ার অধিকার আমাদের দেয়া হয়নি। এটা আমাদের অনুমতি দেয়া হয়নি যে আমরা বিশেষ কোন দলের পক্ষাবলম্বন করি। সবাইকে বুকে টেনে নিতে হবে আমাদের। আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে এবং শাস্তিদানের বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ধর্মশাস্ত্রবিদগণের পক্ষ থেকে সে সময়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তা হচ্ছে, "সব কিছু আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও।"

মিথ্যা-আশার এ রোগ বা ধর্মীয় প্রতিভূদের এ ক্যান্সার দ্বিতীয় বংশধরদের করল বিবশ-চলৎশক্তিহীন। কেননা এসব বংশধরেরা ইসলামী আদর্শের যথার্থ প্রশিক্ষণ নিতে পারেনি এবং নবী, আলী, মুহাজির এবং

আনসারদের মুখ থেকে কোরআন ও ইসলামের ভাষা, ভাবধারা তারা শুনতে পায়নি। তাই দ্বিতীয় স্তরের ধর্মীয় প্রশিক্ষক যারা নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ বিক্রয় করে দিয়েছে তাদের কাছে এ যুগের উত্তরসূরীরা শিক্ষা লাভ করেছে, স্বাভাবিক কারণেই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছে। এ জন্যেই তাদের চেতনা, অনুসন্ধিৎসা এবং ধর্মীয় অনুভূতি সব কিছুই শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত ওয়ামাদের প্রচারণায় বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল। মৌলবাদী দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানদের এটা হচ্ছে দৃঢ় প্রত্যয় যে ( আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার ) হকের পক্ষাবলম্বন, অন্যায়ের প্রতিরোধ মুসলমানদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। কিন্তু মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা পাশাপাশি বিরাজমান খোদা এবং শয়তানকে এক করে ফেলে এবং একজনকে অপরের ব্যাপারে কোন কিছু করার নেই বলে ধারণা করতে থাকে।

দ্বিতীয় ক্যান্সার হচ্ছে অদৃষ্টবাদ। সেটাও এ সময়ে জন্মলাভ করেছে। উমাইয়া শাসনামলে যে নতুন ইসলামী মতাদর্শের জন্ম হয় তা' হচ্ছে, "ধর্মীয় কর্তৃত্ব সম্পন্নগোষ্ঠী" তারা সকল নীতিমালা ও বিশ্বাসকে, বিশেষ করে জিহাদী চেতনার চলৎশক্তি রহিত করার মানসে কোরআনকে ব্যবহার করে। অদৃষ্টবাদের এ ধ্যান-ধারণা একটি ঐশী দর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উমাইয়া রাজত্বেই প্রথম।

দরবেশী ও পবিত্রতার মুখাবয়বের পশ্চাতে যে কি জঘন্য অপরাধ লুকিয়ে থাকতে পারে সেটাই এখন আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অদৃষ্টবাদের ঐশী দর্শন যা কোরআনের আলোকে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে তা' হচ্ছে, "প্রভু হচ্ছেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান নির্দেশদাতা।" এ' আয়াতকে তারা এ' বলে ব্যাখ্যা দেন যে, এ ধরনীতে যে ধরনের দুঃখ-দুর্দশাই নেমে আসুক না কেন আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই তা' ঘটছে। একজন যা করে তা' আল্লাহের অভিপ্রায় অনুযায়ীই করে। একজন যে অবস্থা ও পরিস্থিতি অতিক্রম করুক না কেন, যে অভিরুচিই সে পোষণ করুক, যে তৎপরতায়ই সে নিয়োজিত হোক—সে কাজ অশুভ হোক কিংবা পবিত্রই হোক, সে খুনী হোক বা খুনী নাই হোক, দণ্ডপ্রাপ্ত হোক, দণ্ডদাতাই হোক সব কিছুই প্রভুর ইচ্ছা ও নির্দেশেই বাস্তবায়িত হয়। একজন ক্রিতদাস অপরজন মনিব, কেউ শাসিত কেউ শাসক সব তার অভিপ্রায়েরই অনুবর্তী। আল্লাহই ক্ষমতা দেন আবার তা' কেড়ে নেন। আল্লাহই হত্যা করেন আবার জন্মও দেন।

সম্মান, অসম্মান তাঁর কাছ থেকেই নির্ধারিত হয়। কারো কোন এখ্‌তিয়ার নেই।

অদৃষ্টবাদের এ' ব্যাখ্যার একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে সে সকল ঈমানদার মুসলমানদের ওপর যারা কোরআনকে বুঝতে চাইতেন নবীর জীবনের সঙ্গে পুরাতন ঐতিহ্যকে যোগ করে দিয়ে। আর সে সকল ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে কিছু দুর্বলচিত্ত ইসলামী ব্যক্তিত্বের তৈরী ঐতিহ্য সৃষ্টির যন্ত্র থেকে। আর এ সকল বেদআত ও শেরকমিশ্রিত ঐতিহ্যের সংখ্যা ৪০,০০০ বেশী যা' নবীর নাম ব্যবহার করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ও'সব উদ্ভাবিত কথা বলতে নবী (দঃ) কে আরও ১০০০ বছর বেঁচে থাকা প্রয়োজন ছিল।

ধর্মবিশারদদের এ' শিক্ষার রয়েছে এমনি এক প্রতিক্রিয়া যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত মুসলমানদের চিন্তা-ভাবনায় আনে এক বন্ধ্যাত্ব, এক চলৎ-শক্তিহীনতা। এটা বুঝান হয় আল্লাহ্‌ ক্ষমতা দিয়েছেন বলে উমাইয়ারা শাসন করেছে। আলী (রাঃ) যদি হেরে থাকেন তবে আল্লাহর নির্দেশেই তা' ঘটেছে। একজন ভাল হোক আর মন্দই হোক—বুঝতে হবে ভাল যদি উচ্ছেদ হয় এবং মন্দ যদি ক্ষমতাসীন হয় এটা উচ্চস্তরেব প্রজ্ঞা সঞ্জাত সিদ্ধান্তেই ঘটেছে, আমাদের কাছে সেটা অস্পষ্ট, আল্লাহর ওপরই সব নির্ভরশীল। এটা আমাদের এখতিয়ারের বাইরে। অতএব ক্ষমতার বা ক্ষমতাবানদের প্রতি আরোপিত কোন দুর্ব্যবহার অপরাধ অথবা দুরাচারী কর্ম, আল্লাহর ইচ্ছা, ক্ষমতা এবং নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই নামান্তর।

নবী (দঃ)-এর হিজরতের পর ষাটটি বছর অতিক্রম হয়েছে। বিপ্লবের উপার্জিত সব কিছু বিনষ্ট হয়েছে। অর্ধ শতক পূর্বে যা কিছু অর্জিত হয়েছিল সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আনীত কিতাব স্থাপিত হলো উমাইয়াদের বর্শার অগ্রভাগে। জিহাদ, সংগ্রাম এবং চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে যে সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা বিকশিত করেছিল জনতার অন্তর ও চিন্তা-ভাবনায় সেগুলো আজ উমাইয়া শাসনকে সমর্থনের মাধ্যম হিসেবে পরিণত হল। সকল মসজিদ-গুলোতে এমন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল যে সেগুলো মুশরিকী, স্বৈরশাসন, প্রতারণা এবং জনতাকে বোকা বানাবার সহায়ক শক্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। মুজাহিদদের সকল তরবারী ব্যবহৃত হতে থাকল ঘাতকদের

গঞ্জে। জাকাত এবং অন্যান্য ধর্মীয় কর ব্যয়িত হচ্ছিল মুয়াবিয়ার সবুজ প্রাসাদের জন্যে। বাস্তবতা, ঐক্য, নবী-রসূল, সুন্নাহ, কোরআন এবং ঐশীবাণী ইত্যাকার সব শব্দ উমাইয়াদেরই দখলে এবং তাদের রাজত্বের স্থায়ীত্বের জন্য সেগুলো ব্যবহৃত হচ্ছিল। সমাজের সকল নেতৃবৃন্দ, বিচারক, মুফাচ্ছির, ক্বারী, বিশেষজ্ঞ এবং মসজিদের বক্তাগণ হয় তাঁরা নিহত, নয়তো মসজিদের নিভৃত কোণে ইবাদতে নিয়োজিত অথবা তারা দামেস্কের উমাইয়া শাসনের প্রচার বিশারদ।

মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের না রইলো কোন প্রবক্তা, না কোন মিম্বর, না কোন মঞ্চ। রোম, ইরান ও আরব উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত বিশাল ভূ-খণ্ডে নবীর পরিবারের কোন লোক তাঁর বিপ্লবের কোন নিষ্ঠাবান অনুসারীর কোন বংশধর অবশিষ্ট রইল না। মুহাজির এবং সাহাবাগণের ত্যাগ-তিতিক্ষা সব উবে গেল। মুয়াবিয়ার প্রাসাদ আয়াসহীনভাবে একটি কোষাগার লাভ করল।

অতীত বিপ্লবীরা হয় রাবাজাহর গহীন মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করেছেন কিংবা তারা মার্জাল-আযার ময়দানে নিহত হয়েছেন। দ্বিতীয় পুরুষের বংশধররা যারা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন এবং করেছিলেন জীবনপণ সংগ্রাম তাঁদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হল। অন্যরা অদৃষ্টবাদের নৈরাশ্যবাদী মানসিকতার স্বীকার হল কিংবা ধর্মীয় নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করল। এটা তাঁরা হাদয়ঙ্গম করল যে, বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনের যে কোন প্রচেষ্টা অর্থহীন। অভিজ্ঞতার আলোকে তারা বুঝতে পারছিল যে, ইসলাম রক্ষার, সত্য, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার এবং নব্য-জাহেলিয়াতের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পরিস্থিতি বিগত।

তাই, হিজরতের এ ষাটটি বছর পর সকল ক্ষমতা আজ স্বৈরশাসকের কুক্ষিগত। সব কিছুর মূল্যায়ন হয় ক্ষমতাসীন সরকারের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী। আদর্শ ও চিন্তাধারা বিকশিত হচ্ছিল আদর্শ ও চিন্তাধারা তৈরীর এজেন্টদের হাতে। মস্তিষ্ক ধোলাই, তা' পরিপূর্ণ ও বিষাক্ত হয়েছে এমন কিছু উপাদান দিয়ে যেগুলো ইসলামের নামে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিবর্তন করা হয়েছে ঈমানকে, এটিকে ক্রয় করা হয়েছে, করা হয়েছে অবশ। যখন এ' সকল কোন অস্ত্রই সফলকাম প্রমাণিত হয়নি তখন ঈমানকে বধ করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে অস্ত্র। এক্ষণে হোসাইন (রাঃ) উপস্থিত হয়েছেন

এমন এক শক্তির বিরুদ্ধে যে শক্তির আয়ত্তাধীন রয়েছে আদর্শ, ধর্ম, কোরআন, সম্পদ, তরবারী, প্রচার মাধ্যম, জনতা, অস্ত্র এবং নবী (দঃ)-এর উত্তরাধিকার। হোসাইন (রাঃ) ময়দানে নেমেছেন শূন্য হাতে। কোন কিছুই তাঁর আয়ত্তাধীনে নেই। কি করতে পারেন তিনি? তিনি কি পারেন সংগোপনী দরবেশী জীবন-যাপনের পথে বেছে নিতে? তাঁকে কি এমন ধারণা যুক্তিসঙ্গত করে নেয়া উচিত হবে যে নবী (দঃ) এর দৌহিত্র, আলী (রাঃ) এবং ফাতিমা (রাঃ) এর পুত্র বিধায় তাঁর জন্যে বেহেশ্‌ত লাভ নিশ্চিত?

এ' যুক্তি তিনি মেনে নিতে পারেন না। অন্যান্য ঈমানদাররা একথা বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন আত্মোৎসর্গীতপ্রাণ মানুষ এমনটি ভাবতে পারেন না। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে নির্দিষ্ট যে জিহাদের পথ সে পথকে পরিহার করে তেলাওয়াত ও নফল ইবাদতের সহজ পন্থায় আত্মনিয়োগের দ্বারা তাঁর রেজামন্দি হাসেল সম্ভব এমনটি ধারণা পোষণ করার মত দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ তিনি হতে পারেন কি? তিনি এ' ধরনের কোন সমাধানের পথ পছন্দ করতে পারেন না। হিজরতের এ ষাট বছর পরে অদ্যাবধি এ ধরনের ইবাদতের কিতাব মুদ্রিত হয়নি।

তাঁর জন্যে দু'টি পথ উন্মুক্ত ছিল—হয় তাকে বলতে হত 'না', আমি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে এমন কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করতে পারিনা কেননা সে ধরনের বিপ্লবে একটা সেনাবাহিনী প্রয়োজন, কিন্তু আমার তা' নেই। তাই আমাকে বসে বসে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক জিহাদের ছবক দিতে হবে মাত্র। কিন্তু ইমাম হোসাইন (রাঃ) এ ধরনের সমাধান গ্রহণ করতে পারেন না।

পরবর্তীকালে আমরা দেখি ৬ষ্ঠ ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ, নবী (দঃ) এর পরবর্তী ৯ম পুরুষ (৭৪২—৭৫২ খৃষ্টাব্দ) যিনি দু'টি কারণে বুদ্ধি-বৃত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেন। উমাইয়া শাসনের শেষাংশে এবং আব্বাসীয়া রাজত্বের প্রথমার্ধের মধ্যেই একদিকে গ্রীক দর্শন মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, অপরপক্ষে ভারতীয় ও ইরানী সুফিবাদ এবং খ্রীষ্টানাবাদ মুসলমানদের অন্তরে গভীর শিকড় গেঁড়ে বসে।

এ' সকল কারণে আব্বাসীয় আমলে বুদ্ধিজীবীগণ রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হয়ে উঠলেন। তারা সঠিকতা ও ভুল, সত্য ও মিথ্যার বিষয় চিন্তা-

ভাবনা শুরু করলেন। হযরত আলী (রাঃ) কেন ক্ষমতা হারালেন মুয়াবিয়াই বা কেন ক্ষমতা লাভ করলেন এ'সব ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছিলেন না তাঁরা। তাঁরা তখন আচ্ছন্ন 'ভালবাসার সপ্তনগরী'র চিন্তা-ভাবনার দ্বারা। 'প্রথম অমূর্ত অবস্থার সঙ্গে পরবর্তী অমূর্ত অবস্থার সম্পর্ক কি—এমনি সকল্পিত উদ্ভট চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নিয়োজিত তাঁরা। তাঁরা তখন পৃথিবীর উৎপত্তির রহস্য তথা কোন্ বস্তু দিয়ে আল্লাহ পৃথিবী তৈরী করেছেন এমন অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে মত্ত। তখন তাঁদের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হচ্ছে দর্শন সম্পর্কিত কোরআনের সে সকল আয়াত যা' তাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন থেকে কিছু বিশেষ ধরনের রহস্যবাদী গ্রন্থের উত্তর অন্বেষণ। কখনো কখনো যদিও সে' সকল গ্রন্থে কোন কোনটার সমাধান তাঁরা দিতে পারত প্রকৃতপক্ষে সে' গুলোর কোন মূল্য ছিল না।

ক্রমান্বয়ে তাঁরা আত্মা, দেহ, অমূর্ত-অবস্থা, সত্তা, গুণাবলী, অহংবোধ ইত্যাদি প্রশ্নে মশগুল হল' বিস্মৃত হলো দায়িত্ববোধ, সমাজের প্রতি দেয়া ওয়াদা, সমাজ, সাম্য, নেতৃত্ব সব।

ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ধর্মতত্ত্ববিদ, যুক্তিবাদিতা, দর্শন এবং আদর্শের নামে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা জনতার মাঝে ছড়িয়ে দেয় যাতেকরে ইসলামের ভিত্তি পরিবর্তিত হয় এবং নিজের শাসন ক্ষমতার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়। তেমনি একটা পরিস্থিতিতে বিশেষ করে ইমাম সাদেকের জন্যে যখন রাজনৈতিক সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, যিনি বলতেন, "যদি আমার মাত্র সাতজন বিশ্বস্ত মুজাহিদ থাকত, অবশ্যই আমি বিদ্রোহ করতাম"—তাঁর জন্যে অন্ততঃ বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ছিল নৈতিক দায়িত্ব।

কিন্তু ইমাম হোসেইনের সময় পরিস্থিতি ছিল ভিন্নতর। হিজরতের পর কাটিয়ে বছর অতিক্রম হয়েছে সত্য কিন্তু তখনো পশ্চিমা দর্শনের প্রবেশ ঘটেনি। বিজ্ঞানের সে' সকল মিথ্যা তত্ত্ব যা, ইসলামী ধ্যান-ধারণা পাল্টিয়ে দেয় তারও আগমন ঘটেনি ইসলামের মধ্যে। তখনো ইসলামী আদর্শ তার স্বকীয়তার স্মৃতি নিয়ে বিরাজমান, মানুষের স্মৃতির পটে তা' ভাস্বর।

মুয়াবিয়া চাইতেন ইমাম হোসাইন দামেস্কের মসজিদে বসে বসে ধর্মতত্ত্ব, তফসির, ইসলামী সংস্কৃতি, তৌহীদ, ইসলামের ইতিহাস বা নবী (দঃ) এর রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার এবং অন্য যা কিছু জনগণকে তা শিক্ষা

দিবেন। মুয়াবিয়া ইমাম হোসাইনকে নির্দিষ্ট ভাতা প্রদানের ইচ্ছুক ছিলেন তবে শর্ত ছিল যে, তিনি কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হতে পারবেন না কেননা মুয়াবিয়ার মতে সেটা ইমামের জন্যে বেমানান। কিন্তু ইমাম জানেন সামাজিক কোন কাজের মূল্যায়ন হতে হবে দুশমনদের সে' কাজ কতটা আঘাত হানল এর মানদণ্ডে। তার জন্যে অবশ্যকরণীয় কি ? তাঁকে অবশ্যই বিদ্রোহ করতে হবে। স্বশস্ত্র বিপ্লব ! সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন ক্ষমতার। অথচ ইমাম হোসাইনের সেটা নেই।

ইদানীং একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে যে'টি একদিকে যেমনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অপরদিকে তেমনি সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছে মারাত্মকভাবে। এর বিষয়বস্তু থেকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হবে। আমি পুস্তকটি পড়তে গিয়ে উপলব্ধি করেছি যে আমাদের দ্বারা লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে এটিই একমাত্র পুস্তক— যাতে লেখকের গভীর অধ্যয়ন ও স্বকীয়তার প্রমাণ মিলে। সকল প্রামাণ্য দলিলাদি সংগৃহীত হয়েছে,—দ্বিমুখী বক্তব্যের উভয়টি উপস্থাপিত হয়েছে, উত্থাপিত হয়েছে সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ঘটনাবলী, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং সমালোচনাও করা হয়েছে সুন্দরভাবে। লেখক বিভিন্ন মতামত গ্রহণ ও বর্জন করার ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, তিনি ব্যাপক অধ্যয়ন চালিয়েছেন, ব্যবহার করেছেন অসংখ্য উদ্ধৃতি যেটা একটা নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব ঘোষণার জন্যে গবেষণা কর্মে প্রয়োজন। এ সবের জন্যে পুস্তকটি এমনি গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আমার নেই তবে এটা সত্য যে, আমি তাঁর প্রশংসা করি। আমি তাঁকে এমন একজন বিজ্ঞানী হিসেবে শ্রদ্ধা করি যিনি গভীর গবেষণা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং একজন স্বাধীন চিন্তার ধারক ও বাহক হিসেবে একটি নতুন মতের ঘোষণা দিয়েছেন : "ইমাম হোসাইন ক্ষমতাসীন সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক সশস্ত্র ও বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যেই মদীনা ত্যাগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় এবং জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধার করা।"

এ মতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিনে যদিও এটা একটা আদর্শ সিদ্ধান্ত। কিন্তু তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতির একটা বিশেষ বাস্তবতার সঙ্গে এর বৈপরীত্য আছে। এ' মত পরিত্যাজ্য ঘোষণা করতে গিয়ে একজন

বলেছেন : "ইমাম হোসাইন যেহেতু রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না তাই একটা ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না।" কী বিস্ময়কর ব্যাপার! তবে কোন্ কারণে রসূল (দঃ) এবং হযরত আলী সংগ্রাম করছিলেন? কোন কারণে ইমাম হোসাইনই বা বিপ্লবাত্মক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন? এটা কি রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়? এটা কি সত্য নয় যে অপরাধীরা জনতার ওপর শাসন চাপিয়ে দিয়েছে? সুতরাং যিনি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন স্বৈরাচার ধূলিস্মাৎ করে, ক্ষমতাসীন হয়ে জনগণকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়াই তার কর্তব্য। নেতৃবৃন্দের এটা শুধু অধিকারই নয় বরং অনিবার্য দায়িত্ব।

সুতরাং ইমামকে অবশ্যই সামরিক শক্তি নিয়েই হোক বা রাজনৈতিক-ভাবেই হোক ক্ষমতা জবর দখলকারী সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করতে হবে। কায়েম করতে হবে বিপ্লবী সরকারের শাসন, সত্যকে বাস্তবায়িত করতে হবে সমাজে এবং ইমামকে তাঁর নিজের হাতেই ক্ষমতা রাখতে হবে। আমি বলতে চাই যে, এ' সামরিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবই ছিল ইমাম হোসাইনের লক্ষ্য, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর সে ক্ষমতা ছিল না।

যারা বলতে চান যে, ইমাম হোসাইন একটা সামরিক বা রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তাঁরা এ যুক্তি উত্থাপন করেন যে, কুফা ছিল একটা কেন্দ্র যা' ইমাম হোসাইন তথা নবী (দঃ) ও আলী (রাঃ)-এর পরিবারকে সমর্থন ও নিরাপত্তাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এটা সত্য যে ইরান ছিল কুফার পশ্চাতে এবং ইরানীগণ আলী এবং তাঁর পরিবারকে সমর্থন করেছিল এবং তাঁরা এটাও বিশ্বাস করত যে, সকল কুফাবাসী ইমাম হোসাইনের দখলে, তারা সবাই ইমাম হোসাইনের প্রতিনিধি মুসলিম ইবনে আকীলের বিশ্বস্ত এবং অনুগত।

আমি যদি মেনে নেই যে কুফা ছিল খুবই শক্তিশালী ঘাঁটি এবং যদি ইমাম হোসাইন সেখানে পৌঁছতে পারতেন তবে সেটাকে ইসলামের একটা শক্তিশালী ভিত্তিভূমি হিসেবে রূপান্তরিত করতে পারতেন এবং দামেস্ক সরকারকে পরাভূত করে তার নেতৃত্বে একটা স্বাধীন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। এর পরও আমি বিশ্বাস করি ইমাম হোসাইনের বিপ্লব কোন রাজনৈতিক ও সামরিক বিপ্লব ছিল না।

এ ব্যাপারে আমাকে যোগ করতে হচ্ছে—এ জন্যে নয় যেমন কিছুলোক বলে যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইমাম হোসাইনের জন্যে দোষণীয়।—না। এটা হচ্ছে একজন ইমামের দায়িত্ব। এ প্রসংগে আমি যা' বলতে চাই তা' হচ্ছে যে তেমন কোন বিপ্লব ঘটাবার সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি তার জন্যে বিরাজমান ছিল না।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ঃ আপনি নিজেইত বললেন যদি ইমাম হোসাইন কুফায় পৌঁছতে পারতেন তবে কুফার পক্ষে সম্ভাবনা ছিল দামেস্ককে পরাজিত করা এবং এর ফলশ্রুতিতে সরকারী নেতৃত্ব ইমাম হোসাইনের করায়ত্ত হত—তবে কেন আপনি এমনটি বলছেন? সুতরাং ইমাম হোসাইনের বিপ্লবকে আপনি উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামরিক বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করতে চাইছেন না কেন? এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হলে আমাদের গোড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে মদীনা থেকেই ইমামের আন্দোলনের ধরন কি ছিল তার প্রতি।

ইমাম হোসাইন মদীনা ছেড়ে মক্কায় পৌঁছলেন। মদীনায় গিয়ে তিনি কুফাবাসীদের আমন্ত্রণ পেলেন ঃ "আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি এবং আশা করি আপনি নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। আমরা আপনার নেতৃত্বের প্রয়োজনানুভব করছি। আমরা আপনাকে শাসনভার দিতে চাই। জবর দখলকারী এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা আপনার পাশে দাঁড়াব। আমরা আপনার নিরাপত্তার জন্যে দায়িত্ব বহন করব। অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে এ শোষক সরকার থেকে মুক্তি দিন।"

মদীনায় ইমাম হোসাইন ঘোষণা করেন ; "আমার মাতামহ ও পিতার ঐতিহ্য অনুসরণ করে আমি মদীনা ত্যাগ করছি জনগণকে সুকৃতি সম্পাদন ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাঙনের দাওয়াত দেয়ার অভিপ্রায়ে।" এরপর তিনি ৬০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে স্বপরিবারে কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই মক্কায় উপস্থিত হলেন।

মক্কায় বাৎসরিক হজ্জ সমাপনের জন্যে যে সকল হাজিগণ সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশে তিনি বললেন, "আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছি।" একজন রাজনৈতিক বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী এমনি ভাষায় কথা বলেন না। তিনি অবশ্যই বলেন, "আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি—হত্যা করতে। বিজয়ী হব আমি। দুশমনদের নিশ্চিহ্ন করব আমি।"

কিন্তু ইমাম হোসাইন জনগণকে এ বলে সম্বোধন করলেন, "মৃত্যু হচ্ছে একজন আদম সন্তানের জন্যে এমনি মোহনীয় যে তা প্রাণবন্ত সুন্দর বালিকার কণ্ঠহারের সঙ্গে তুলনীয়। মৃত্যু হচ্ছে মানব সন্তানের জন্যে একটি অলংকার। তখন তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন, এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর দিকে।

এটা কি একজন রাজনীতিজ্ঞের জন্যে সম্ভব যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এমন একটা দূরান্তরের শহরবাসীর আহবানে উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীর শাসনাধীন থেকে এবং সে শাসিত এলাকার একটি জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করে বিদ্রোহী এলাকায় চলে গিয়ে তাদের বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা যে "আমি আসছি"? কি করে তিনি তেমনি অবস্থায় নিজের স্ত্রী, শিশু-সন্তানাদি ও তাঁর পারিবারের সকল সদস্য, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং পারিবারিক অন্যান্য পুরুষ ও মহিলাগণকে নিয়ে গোপনে বরং প্রকাশ্য কাফেলাসহ শহর থেকে শহরান্তরে খুব স্বাভাবিক-ভাবেই অতিক্রম করেছেন অথচ সে সকল শহরগুলোত দুশমনদেরই দখলে ছিল যারা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক?

এ'ভাবে তিনি ছয়শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন, অতঃপর প্রবেশ করেছেন মক্কায়। সেখানে দামেস্ক সরকারের সকল শাসিতরা, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ ও প্রশাসকরা, সকল দল ও ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা সমবেত হয়েছিলেন। এখানে তিনি পুনর্বার ঘোষণা করেন যে তিনি কুফায় যেতে অভিলাষী। তিনি আরব-উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সম্পূর্ণ পূর্ব-পশ্চিম বরাবরেখা অতিক্রম করে একইভাবে ইরাকে কুফার নিকট পৌঁছলেন তিনি। আর কুফা হচ্ছে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কেন্দ্র। বলাই বাহুল্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার এমনি গতিবিধির অনুমতি দিতেন না।

যদি একজন সর্বজন পরিচিত কিংবা সাধারণ বিরুদ্ধবাদী রাজনীতিবিদ সরকার বিরোধী তৎপরতা চালানোর উদ্দেশ্যে দেশের বাহিরে অবস্থিত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করার জন্যে দেশ ত্যাগ করতে চায়, কোন্ অবস্থায়, কোন্ পন্থায় এবং তাঁর কি আহবান থাকে এটা স্পষ্টতঃ সবার জানা।

অবশ্যই বিষয়টি তাকে প্রকাশ করা চলবে না। তাঁর আহবানের বিষয়টিও পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেয়া উচিত হবে না। তাঁর উদ্দেশ্য এবং যাত্রার বিষয়

সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখতে হবে যাতে কেউ তা' ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের প্রতি ঘোষণা করেন না, "আমি একজন বিপ্লবী যে ক্ষমতাসীন সরকারকে অস্বীকার করে। আমি সরকারের আনুগত্য স্বীকার করব না। আমি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বিপ্লবীদলের সঙ্গে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে দেশ ত্যাগ করতে চাই। বিপ্লবীরা আমাকে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে বলেছে। এ জন্যেই আমি দেশ ত্যাগ করছি। দয়া করে আমাকে দেশান্তরের অনুমতি বই (passport) স্বাক্ষর করে দিন, তবে তারা তাকে পাসপোর্ট দিবেন না বরং গ্রেফতার করবেন, হত্যা করবেন। কিন্তু সত্যিই ইমাম হোসাইন কি করেছেন ?

তিনি সরকার, শাসকগোষ্ঠী, সামরিক প্রশাসক এবং জনতার সম্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে, স্পষ্ট ও নির্দিধায় ঘোষণা দিলেন, "আমি আনুগত্য স্বীকার করছি না। আমি মক্কা ত্যাগ করছি। কুফায় হিজরত করতে যাচ্ছি আমি, আমি হিজরত করছি মৃত্যুর দিকে। আরম্ভ করেছি চলা।" জনগণ যদি হঠাৎ করে বুঝতে পারত ইমাম হোসাইন নগরী ত্যাগ করছেন কিংবা ইমাম হোসাইন যদি সংগোপনে শহর ছাড়তেন এবং নবী (দঃ) যেভাবে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছেন সে পন্থায় স্বগোত্রীয়দের সহায়তায় হিজরত করে কুফায় পৌঁছতেন তবে সময়ের ব্যবধানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং জনগণ বুঝত তিনি কুফাতে আছেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গেই আছেন। তখনই বলা যেত যে ইমাম হোসাইন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।

তাঁর গতিবিধি, প্রকৃতি, কাফেলার সঙ্গে তাঁর পথ চলাই প্রমাণ করে যে তিনি ভিন্ন উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন। না ভ্রমণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না নিঃসঙ্গ জীবনযাপন। করেননি তিনি আত্মসমর্পণ কিংবা রাজনীতিকে পাশ কাটাননিও তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না রাজনৈতিক বিদ্রোহ। এটা তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় বা নৈতিক কোন বিষয়ও ছিল না। তবে এটা কি ছিল ?

এটা এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যেখানে পৌঁছতে চিন্তাশক্তি বিবশ হয়ে যায়। ব্যক্তিত্ব বিক্রয় করে দেয়া হচ্ছিল। ঈমানদার হয়ে পড়ছিল বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ। গুণাবলী হয়ে পড়ছিল মূল্যহীন। যুব সম্প্রদায় হয় হতাশাগ্রস্ত নয়তো আত্মবিক্রিত হতে চলছিল। ইসলামের অগ্রণী প্রবক্তাদের

হয় শহীদ করা হয়েছে কিংবা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কাউকে আবার প্রবল চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে কিংবা পরিবর্ত করা হয়েছে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন সমাজ থেকে একটা প্রতিবাদী শব্দও উচ্চারিত হয়নি। কলম ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছিল। জিহবা দেয়া হচ্ছিল কেটে। ওষ্ঠে লাগান হচ্ছিল তালা। সত্যের সকল নিশান বরদারগণ পরাভূত হয়েছিলেন এবং বিশিষ্ট বিশ্বস্ত সত্যানুসারীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল।

একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতা ইমাম হোসাইন দেখলেন তাঁর নীরবতা অবলম্বন ইসলামকে একটা সরকারী ধর্মে পরিণত করবে। ইসলাম একটা সংকীর্ণ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে, অন্য কিছু নয়। অন্যান্য সরকার এবং শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলাম হয়ে পড়বে অভিন্ন। যখন তাদের ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হবে, তাদের বাহিনী এবং সরকার ধ্বংস হবে, কিছুই থাকবে না তাদের। এটা একটা ঐতিহাসিক স্মৃতি একটা অতীত দুর্ঘটনা যা' সংগঠিত হয়েছে, শেষও হয়েছে, এর চেয়ে মহত্তর কিছু হবে না।

এ জন্যেই ইমাম হোসাইন উভয় সংকটের সম্মুখীন হলেন। না তিনি নিশ্চুপ থাকতে পারলেন, না পারলেন যুদ্ধ করতে। তিনি মূক থাকতে পারেন না। কেননা সময় এবং যথার্থ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, দ্বীন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অর্থ, আদর্শ ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ (দঃ) যা' এনেছেন এবং ইসলাম যা' কিছু দিয়েছে যা জিহাদ তথা গভীর চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রামের ফলে বিকশিত হয়েছে সব কিছুই জনতার মন ও গহীন সচেতনতা থেকে মুছে যাচ্ছে। অন্যরা সবাই ক্ষমতাসীন সরকারের তাবেদারী করছে। তারা প্রতারিত। তাদের সমকালীন পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীবতা, ভীতি ও আত্মসমর্পণমূলক। কিন্তু তিনি নীরব থাকতে পারেন না কেননা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তাঁর দায়িত্ব।

অপরপক্ষে তিনি যুদ্ধ করতে পারেন না কেননা তাঁর সেনাবাহিনী নেই। তিনি ক্ষমতাসীন স্বৈরশাসকের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ। না তিনি সোচ্চার হতে পারেন, না আত্মসমর্পণ করতে পারেন, না পারেন আক্রমণ চালাতে। তিনি শূন্য হাতে হলেও এক কঠিন গুরুদায়িত্ব তাঁর স্কন্ধেই চেপেছিল। সরকারী ক্ষমতার কোন শরিকানা তাঁর মাতামহ নবী (দঃ), পিতা হযরত

আলী, ভ্রাতা ইমাম হাসানের সংগ্রামের সুফলের ভাগও তিনি পাননি। তার জন্য ছিল এক দিকে কিছু সম্মান, অপরদিকে বিরাট ধ্বংসের সম্ভাবনা এবং ছিল বিরাট দায়িত্ব।

তিনি একাকী, অস্ত্রহীন। দুনিয়ার একটা শ্রেষ্ঠতম অত্যাচারী সাম্রাজ্যের ক্ষমতাসীনগণ যারা ভক্তির, পবিত্রতার ও ঐক্যের সুন্দরতম এবং সর্বাধিক প্রতারণামূলক মোড়কে আচ্ছাদিত সে বিশাল ক্ষমতাধর শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে তাঁকে। সঙ্গীহীন তিনি। তিনি হচ্ছেন এমনি এক জন সাথীহীন যিনি একটি বিশেষ চিন্তাধারার বিশ্বাসীদের দায়িত্বশীল। আর এ' চিন্তাধারায় একজন এককভাবে হলেও ভাগ্য নির্ধারণকারী শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য কেননা দায়িত্ব বর্তায় সচেতনতা ও ঈমান থেকে, ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে বা সম্ভাবনার পথ দেখে নয়। কে বেশী সচেতন ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন? ইমাম হোসাইন থেকে কে অধিকতর সচেতন হতে পারে?

কি তাঁর দায়িত্ব? সত্যের মূলোৎপাটন, জনতার-অধিকার হরণ, সকল মূল্যবোধের উৎখাত, বিপ্লবের সকল স্মৃতি মুছে ফেলা, বিপ্লবের বাণী ধ্বংস করা, ইত্যাদির বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার দায়িত্ব তাঁর। জনগণের গভীর ভালবাসার ধন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিশ্বাস যা' ধ্বংস করা তাঁদের কট্টর দুশমনদের লক্ষ্য সেটাকে রক্ষা করাও তাঁর দায়িত্ব। তারা চায় আবার গোপন হত্যাযজ্ঞ চালাতে, নির্বাসন দিতে, জনতাকে শৃংখলিত করতে, আমোদ-প্রমোদের পূজারী সাজতে, বৈষম্য সৃষ্টি করতে, অর্থ পুঞ্জিভূত করতে, বিক্রয় করতে মানবিক মূল্যবোধ, ঈমান, সম্মান; চায় ওরা নতুন ধর্মীয় নির্বুদ্ধিতার সৃষ্টি করতে। ওদের অভিপ্রায় গোত্রীয় কৌলিন্য প্রথা, নব্য অভিজাততন্ত্র, জাহিলিয়াত ও মুশরিকী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

আদর্শের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, সামাজিক অপরাধ, জনগণের অধিকার হরণ এবং ঐশী বিপ্লবকে রক্ষার জন্যে নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে যে জিহাদ চলছিল তাকে গতিশীল রাখা ইত্যাদির জন্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ, সংগ্রাম পরিচালন ও অস্ত্র ধরার দায়িত্ব একজনের ঘাড়ে ন্যাস্ত হলো। সম্পূর্ণ একা! সত্য, ইনসাফ ও সচেতনতার পক্ষে, জনতা এবং আল্লাহর পক্ষে একজনও পাওয়া যাচ্ছে না। সকল ময়দান ফাঁকা—বিজিত। সত্যের রক্ষক যুদ্ধারা হয় শাহাদত প্রাপ্ত হয়েছেন নয়তো পালাতে বাধ্য হয়েছেন।

শূন্য হস্ত তিনি—সম্পূর্ণ একা। সে' শত্রুদের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত যাদের কাছে অন্য সবাই পরাজিত। সবাই নিশ্চুপ, বিরুদ্ধাচারণ করার কেউ নেই। সাধারণভাবে সবাই বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত। কোন সম্ভাবনা নেই তাঁর সম্মুখে।

না তিনি নিশ্চুপ থাকতে পারছেন, না পারছেন মুখ খুলতে। তিনি নির্বাক হতে পারেন না কেননা সে' একাকী মানুষটির তৎপরতার আশায়ই দায়িত্ব বোধ অপেক্ষা করছে। তিনি আওয়াজ তুলতে পারছেন না কারণ তাঁর কণ্ঠস্বর খাটো করে দেয়া হয়েছে। তাঁর চিৎকার আক্রোৎসর্গকৃতদের দুর্বিসহ নীরবতা ভেদ করতে পারবে না। পারবে না একটা বিদ্রোহের অনল জ্বালাতে, জাহেলিয়াতের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা, সরকারী ধর্মের পঙ্ক থেকে অন্য সবাইকে নির্বোধ বানাবার অপকর্মও এটি বন্ধ করতে পারবে না। খেলাফতকে কেন্দ্র করে জিহাদ, বিজয়, আদর্শের লাভ, প্রচারণা, জামায়েত, হজ্জ, কোরআন এবং ইসলামের নামে যে' অন্তর্বিরোধ, মিথ্যার ভয়ানক যুদ্ধ চলছিল সে সকল ক্ষেত্রেও হোসাইনের একক চিৎকার কিইবা করতে পারে। ইতিমধ্যে নাচ-বাজনা এবং ললিত কলার উন্নতি ঘটেছে। খেলাফতের নামে ক্ষমতা মদমত্ততা এবং আমোদ-প্রমোদ ও বল্গাহীন অশুভ স্বাধীনতা আত্মপ্রকাশ করল।

তাঁকে অবশ্যই লড়তে হবে। কিন্তু তিনি অক্ষম। কতইনা বিস্ময়কর অবস্থা! নিশ্চয় তাঁকে কিছু করতে হবে কিন্তু ক্ষমতা কৈ! এ দায়িত্ববোধ তাঁর সচেতনতাকে ক্ষতবিক্ষত করে। এ হচ্ছে 'হোসাইন হওয়ার' ফলশ্রুতি যোগ্যতা উদ্ভূত কিছু নয়। তিনি এখনও হোসাইন, একাকী, অক্ষম, অস্ত্রহীন, এবং অসহায়।

এখন তাঁর কি করা উচিৎ? 'হোসাইন হওয়া' তাঁকে সংগ্রামের আহবান জানায়—কিন্তু অস্ত্র কোথায়? অথচ এ অবস্থাতেও তিনি দায়িত্ব এড়াতে পারছেন না। তথাকথিত বিচক্ষণতা, ধর্ম, ঐতিহ্যের প্রবক্তা, সার্বজনীন আইনের ভক্তরা, কল্যাণ এবং যুক্তিবাদীরা সবাই বলে "না"। কিন্তু হোসাইন বলেন 'হাঁ'। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি মদিনা ত্যাগ করলেন। হজ্জ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেত মুসলমানদের সম্মুখে তাঁর সে' অভাবিতপূর্ব 'উত্তরের' বিষয় ঘোষণার জন্যে তিনি মক্কায় এলেন। আর মক্কা ত্যাগ করলেন 'কিভাবে'—এ' প্রশ্নের উত্তর দানের জন্যে।

ইতিহাসের এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে প্রশ্নটি বিরাজ করছিল যখন জনসাধারণ ও ইসলামের ভাগ্য পরিবর্তিত ও নির্দিষ্ট হতে যাচ্ছিল। সে মুহূর্তে সবকিছুর বিপর্যয় ঘটছিল। যে সকল বুদ্ধিজীবী এবং সচেতন মানুষ সত্য, ইনসাফ, ইসলামের স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং যারা দেখে, অনুভব করে, বুঝে মর্মপীড়ায় ভোগছিলেন, নিজেদেরকে দায়ী মনে করছিলেন তাঁদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল একটা বিপ্লবের প্রত্যাশা। তাঁরা ভাবছিলেন, "কি করা উচিত।"

প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা উত্তর থাকে। অদৃষ্টবাদী বলে, "কিছুই না।" যা' কিছু ঘটছে তা' ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাময়, নিগূঢ় রহস্যের ফলশ্রুতি হিসেবেই ঘটতে থাকবে। সেটা আল্লাহরই সিদ্ধান্ত। তোমাকে যা' দেয়া হয়েছে তার ওপরই তোমাকে তৃপ্ত হতে হবে এবং কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে হবে সে' জন্যে। কেননা নিজের ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে তুমি স্বাধীন নও।

তারা বলে, এটা সত্য, নির্যাতন, অপরাধ, জবর দখল, অধিকার, জিহাদের আহবান, জাকাত, নবী প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য, ইসলামের বিজয়, কোরআনের প্রচার ও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে অগ্নি উপাসকের মন্দির, দেবালয় মসজিদে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি অনেক ঘটনাই আছে। কিন্তু এসবই মিথ্যা, প্রতারণা।

কি-ই-বা করার আছে! আল্লাহর ইচ্ছাভিন্ন'ত একটা পাতাও গাছে থেকে পতিত হয় না। প্রভু ইচ্ছা করলেই সব কিছু ঘটে। এটা হচ্ছে সে' প্রজ্ঞাবানেরই বিধান। কেউ তা' প্রতিহত ও সমালোচনা করার এমন কি "এটা কেন এ ধরনের হলো" এতটুকু প্রশ্ন করারও ক্ষমতা রাখে না। সবাই নিজের তকদীর অনুযায়ী চলছে। ভাল এবং মন্দ যাই ঘটুক না কেন তা ঘটছে এক মহাপরিকল্পনার অধীন এবং বিষয়টি কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে। আলী (রাঃ) পরাজিত হয়েছেন, একাকীত্ব বরণ করেছেন, কিংবা মুয়াবিয়া বিজয়ী এবং ক্ষমতাসীন হয়েছে—এটি আসলে রাব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘটেছে। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা উত্থান দেন।" "কেউ যখন পরাভূত হন তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারেই তা' ঘটে।" "মহা ক্ষমতাবান কাউকে ক্ষমতাও দিয়ে থাকেন স্বীয় অভিপ্রায় মোতাবেকই।" কি বলতে পারে মানুষ। মানুষ কি করতে পারে?

মানুষত শুধু ধৈর্যাবলম্বন ও নীরবতা পালন করতে পারে যে তকদীরের জালে আবদ্ধ, যার সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত। অন্য কিছু না।

আমরা লক্ষ্য করছি এ ধরনের দর্শনের দৃষ্টিতে সামর্থ্য, অযোগ্যতা, জিহাদ ইত্যাকারের সব প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই। তারা সকল দায়িত্ববোধ হতে মুক্ত কেননা উত্তম পথ বেছে নেয়ার সুযোগ সে' দৃষ্টিভঙ্গিতে অবর্তমান। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বলেন ঃ কি আমাদের করতে হবে? কোন্ ভিত্তিতে? কার বিরুদ্ধে?—আল্লাহ সবাইকে আশান্বিত হতে বলেছেন। বলেছেন মুক্তি ও বেহেশত অন্বেষণ করতে। আমরা কি করে একটা লোককে ঘৃণা করতে পারি, বলতে পারি সে নরকে যাবে এবং সে জন্যে তার বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করতে হবে আমাদের? এটা মনে হচ্ছে আপনি যেন খোদা অস্বীকারকারীদের মত কাজ করছেন—মহাপ্রলয়ের পূর্ববর্তী দিবসে, বিচার দিবসের পূর্বেই যেন আপনি শাস্তি দিচ্ছেন।

"এ ঘৃণিত ব্যক্তিটিকে, এ অপরাধী মুয়াবিয়াকে যদি মহাপ্রলয়ের দিবসে প্রভু ক্ষমা করেন তখন কি হবে? তাকে ক্ষমা করোনা তার শাস্তিও দাবী করোনা, ভবিষ্যতে প্রভু যদি তার ওপর রহমত বর্ষণ করেন তখন তোমার কাছে কোন্ উত্তর থাকবে? কি কর্তব্য হবে তোমার? কি করা উচিত? কাকে তুমি জিজ্ঞেস করবে? উত্তর দিবে কে? কেই-বা সক্রিয় হবে? কেউ নয়। কিছুই না। আমাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে, দেখতে হবে আল্লাহ কি করেন।

এ সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপরন্তু এটাও বলে যে, আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, মুয়াবিয়া এবং ইয়াজিদ সবাই ছিলেন নবী (দঃ)-এর সাহাবা। তাঁরা সবাই মুজাহিদ ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ এবং ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ করেছেন। পবিত্র ও অপবিত্র, নিপীড়নকারী ও নিপীড়িত এবং দোস্ত ও দুশমন এদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধ নেই। বিশেষজ্ঞরা জনতার মতামতের অনুবর্তী হতে বাধ্য নয়। উম্মী জনতার পক্ষে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও তাত্ত্বিকদের কাজে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। আল্লাহ হচ্ছেন চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। রহমানুর রহীম হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম দয়াশীল। তুমি এবং আমি 'কেন' এ' প্রশ্ন করার অধিকার রাখি না।

চরমপন্থীরা, মৌলবাদীরা উত্তরে বলেন ঃ "মানুষ যেমন অনেক মত ও পথের হয়ে থাকে, খোদাকে পাওয়ার জন্যে পথও রয়েছে বিভিন্ন। জিহাদ-ই কি একমাত্র পথ? ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নামাজ ইসলামের একটি ভিত্তি। বিপরীত পক্ষে জিহাদ হচ্ছে একটি শাখা যা ভাল কাজের উৎসাহ দান এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধের সঙ্গে জড়িত। আপনি কি স্বয়ং ধর্মীয় রীতিনীতি, অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি, বিধান, নির্দেশাবলী, কর্তব্যসমূহ, শর্তাবলী পালন ও অনুসরণ করে চলছেন? ধর্মীয় প্রার্থনায় সন্দেহ সংক্রান্ত যে সকল বিধি-নিষেধ আছে যেগুলো লগারিদম-টেবিলের মত জটিল সে'গুলো আপনার স্মরণ আছে কি? আপনি কি পবিত্রতা-অপবিত্রতা সংক্রান্ত নির্দেশসমূহ অবগত আছেন? নামাজের ভিতরকার গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যক নিয়ম-কানুনগুলোই কি আপনার সব জানা আছে?

"আপনারা যারা জনগণের জন্যে ভাবছেন এবং তাদেরকে পথনির্দেশ ও নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন তাঁরা কি নিজেরাই সংশোধিত হয়েছেন? আপনি কি দরজায় পৌঁছতে পেরেছেন যে ভুলজনিত কারণে আপনাকে হোঁচট খেতে হয় না?—স্বার্থপরতা, কামনা-বাসনাকে কি জলাঞ্জলি দিতে পেরেছেন? পার্থিব সকল আশা-আকাংখামুক্ত হতে পারছেন কি আপনি? পেরেছেন কি সম্পূর্ণভাবে পবিত্র এবং নিষ্পাপ হতে? আপনার সকল চিন্তা ভাবনা কাজ-কর্ম এমন কি সামান্যতম বিষয়টিও কি খোদার সন্তুষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট করতে পেরেছেন? সম্পূর্ণ অনাবিলভাবে একমাত্র খোদার জন্যেই? আপনি কি আপনার ধর্মের নীতিমালা এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অনুপ্রবেশিত গলদগুলোকে সংশোধন করতে পেরেছেন? আপনি নিষ্কলুষ ও পরহেজগারী অর্জন করেছেন? সমাজকে সংস্কার করার যে দায়িত্ব আপনি বহন করছেন সে জন্যে কাংখিত পবিত্রতা এবং সংশোধনের মানদণ্ডে আপনি উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে কি ধারণা করছেন?

অপর পক্ষে বেহেশতের রয়েছে অষ্টদ্বার। জিহাদের দ্বার দিয়েই আপনি সেখানে প্রবেশ করতে বাধ্য নন। জিহাদ স্বর্গে প্রবেশের অনেকগুলো দ্বারের একটি মাত্র। নামাজ, অন্যান্য এবাদত, এবং আরাধনা হচ্ছে বিপদমুক্ত কতগুলো চাবি এবং সেগুলোর যে কোন একটি অবলম্বনে ক্ষতি, লোকসান, বিপদ বা ঝুঁকি ছাড়াই আপনি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন।

এমন বহু সেবামূলক বা মহৎ কাজ আছে যেমন নিরন্নকে অন্নদান, দরিদ্র পরিবারের প্রতি যত্ন নেয়া, পবিত্র স্থানসমূহ ভ্রমণ, নামাজ, আরাধনা,

শরাহেজগারী, বয়াত হওয়া, আত্মনিবেদন, প্রতিবেশীকে সাহায্য, বিভিন্ন বিশেষ নামাজ অনুষ্ঠান, আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা, উদ্ধিরা ধরা আপনাকে একই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। আপনি যিনি জিহাদের পথ গ্রহণ করেছেন একই স্থানে উপস্থিত হবেন। অতএব জিহাদের কঠিনতর ভয়াবহ পথকে অবলম্বন করে কেন আপনি অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন?

কিছু কিছু দোয়ার কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে যে উক্ত সব পুস্তকের বিশেষ কোন দোয়ার ওপর আমল করার কারণে আমলকারীকে সত্তরজন বদরী শহীদের চেয়েও অধিক পুরস্কার ও সৌভাগ্য দেয়া হয়েছে। অতএব এটা কি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে না যে কি করতে হবে?

অন্য মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন পূত চরিত্রাধিকারী কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা আলেমের পক্ষে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ধর্মীয় বিচ্যুতিরই নামান্তর। এর অর্থ হচ্ছে ধর্মকে বস্তুবাদীদের নিকট বিক্রয় করা, নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় পরিহার করে সম্পদলিপ্সা ও পার্থিব বস্তুর পশ্চাতে ধাবমান হওয়া। অথচ এ দু'টিকে একত্রিত করা যাবে না।

নবী (দঃ) কি বলেননি যে, পবিত্র যুদ্ধসমূহ হতে ফিরে, ক্ষুদ্রতর জিহাদ ছেড়ে আমরা বৃহত্তর জিহাদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি। তাঁরা তখন রসুল (দঃ) কে জিজ্ঞেস করে, বৃহত্তর জিহাদ কি? তিনি উত্তরে বলেন, 'ইন্দ্রিয় স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জিহাদ'। সুতরাং ক্ষুদ্র জিহাদ ত্যাগ করে বৃহত্তর জিহাদে শরিক হতে হবে। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে, বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে নয়।

সাহাবাগণ, অন্যান্য ব্যক্তিত্ব, ধর্মতাত্ত্বিক এবং ধর্মবিশারদগণ শাসক-গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, "আলীর চিন্তার ধরন বাস্তবানুগ নয়, বড় কঠিন সে পথ। অবশ্যই বাস্তববাদী হতে হবে, ভাববাদী নয়। আমাদের জানা বিশ্বের বৃহত্তর অংশের শাসক হচ্ছেন আলী, এর পরও তিনি নিজের জুতা নিজেই সেলাই করছেন। তিনি একজন সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় কাজ করছেন। মানুষ যা' দেখে সে ভিত্তিতেই বিচার করে। বিশেষতঃ এটা সত্য যে যখন ইরান এবং রোম পদানত হল, মুসলমানরা তখন পরিচিত হল বিশাল আকাশচুম্বী প্রাসাদ, রাজার রাজা ইরান সম্রাট এবং রোমের সীজারের বৈভব ও রাজকীয় প্রতাপ ও সম্মানের ঐতিহ্য এবং

জাঁকজমকতার সঙ্গে। না এ নিম্নমানের জীবন যাপন গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ইসলামী সরকারের সুনাম এবং মর্যাদার জন্যে ভাল নয়।

বিপরীত পক্ষে আলীর শাসন কি ইরান এবং রোমের অভিজাত সমাজে সহনীয় হত? আলী (রাঃ) যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন বেতনের হার পরিবর্তন করে তিনি সবার জন্যে সমান বেতন নির্ধারণ করলেন। ওসমান ইবনে হানিফের মত বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও নিকটতর বন্ধুদের এবং বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের যে তিন দিরহাম বেতন নির্দিষ্ট করেছিলেন একজন দাসের ক্ষেত্রেও তা' প্রযোজ্য ছিল।

এদের ধারণায় এ ধরনের অর্থব্যবস্থা অবাস্তব। তারা যুক্তি উত্থাপন করে, "আমরা দেখেছি, এখনো আমাদের স্মরণে আছে যা' আরবের দ্বারা বিজিত হয়েছে এবং এখনো আলী শাসিত ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সে পারস্য সম্রাট খসরু যখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হন যুদ্ধাবস্থায় যেহেতু তাঁকে যদ্দুর সম্ভব আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে হচ্ছে সে জন্যে যুদ্ধের ময়দানে আনীত নারী, দাস-দাসী, সেবক-সেবিকা এবং বাদ্যকারের সংখ্যা হ্রাস করে তিনি সাত হাজারের মধ্যে সীমিত করেন।

তারা বলেন, এটা সঠিক ছিল কি ছিল না সে যুক্তি উত্থাপন করতে চাইনে। আমরা বলছি, যেহেতু আলী অকৃতকার্য হয়েছেন অতএব তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবধর্মী ছিল না। তিনি সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। তিনি কোন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন না! কোন সমাজতত্ত্ববিদও ছিলেন না তিনি। তিনি ছিলেন বড়ই কঠোর। বহিরস্থ কোন ব্যক্তিত্ব, গোত্রপতি, ক্ষমতাবান, অভিজাত ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারবর্গের সম্মানিত সদস্যবর্গ কাউকে তিনি সমীহের চোখে দেখতেন না।

তাদের আরও বক্তব্য হচ্ছে, "ইমামত ও নবুয়তের সঙ্গে অবশ্যই আপনি খেলাফতের তুলনা করতে পারেন না। অবশ্যই নবী (দঃ) ও আলী (রাঃ) কে কখনই মুয়াবিয়ার সঙ্গে তুলনা করা চলবে না। তাঁকে বিচার করা উচিত সীজার বা রাজাদের মানদণ্ডে। দামেস্কের শাহী দরবার যাকে আপনি সবুজ প্রাসাদ বলে আখ্যায়িত করছেন যাতে জনগণের অর্থের অপচয় হয়েছে, তাদের অধিকারকে পদদলিত করা হয়েছে—কিন্তু সেটা কি সে স্থান

নয় সেখান থেকে দুনিয়ার ইসলামী সাম্রাজ্য ইরান, রোম ইত্যাদির ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করেন? এর পরও কিন্তু সে প্রাসাদ রোমান কাউন্সিলের ইমারত বা একজন গভর্নর যাকে সিরিয়া শাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁর প্রাসাদ থেকে অনেক সাদাসিধে অনাড়ম্বর।

আবুজর মুয়াবিয়াকে একথা দ্বারা আক্রমণ করেছিলেন, "আপনি কেন সফেদ রুটি খান এবং গমের ভিতরের অংশটাই খান কেন? কেন আপনি দিনে এবং রাতে ভিন্ন ভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেন।"

আলীর অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যেন নবীর জামানার মত তারা এখনও মদীনায়ই বাস করছেন এবং 'সভ্য' রোমীয় এবং ইরানীরা যারা ইসলামী বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা হিজরতকারী এবং সাহায্যকারী।

তাদের যুক্তি হল, "বিষয়টির আপেক্ষিকতা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। হুবহু ইবাদত এবং সাবিকতাবাদ হচ্ছে ভাববাদ। আপনাকে অবশ্যই বাস্তবতা বিচার করতে হবে। যে সকল দরিদ্র পশ্চাদপদ মুসলমানরা দুনিয়ার এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ শাসন করছিল পূর্ব এবং পশ্চিমের দু'টি সাম্রাজ্য যার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদেরকে সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি বুঝান কঠিন ছিল—সে ক্ষেত্রে নবীর জামানায় যেভাবে সবাই চলছিল এবং আলী যে আচার-ব্যবহার করছিলেন সেটাই ছিল তাদের জন্যে সঠিক।

ঐতিহ্য, বিধি-বিধান, সামাজিক সৌজন্যবোধ, অর্থনৈতিক এবং অভিজাত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, রুচিবোধ, সাহিত্য, কাব্য, বাদ্য-বাজনা, নাচ, আমোদ-প্রমোদ, সামাজিক সম্পর্ক, 'সভ্য' রোম ও ইরানের নৈতিকতা ও আচার-আচরণ, শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ ও অভিজাত-তান্ত্রিক শাসন, সীজার ও রাজন্যবর্গের শাসন ব্যবস্থা ভিন্ন আদর্শ, আমলা-তান্ত্রিক, দরবারী ও গ্রীক এবং রোমীয় ঐতিহ্যের শাসন ব্যবস্থা প্রসূত পৌরহিত্যবাদ, কারনিক ঐতিহ্য এবং মালিকানা সর্বোপরি উন্নততর রোমান ও ইরানী সভ্যতার অবশ্যই সাধারণ ইসলামী সমাজের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সম্পদ, ক্ষমতা, উন্নততর অবস্থা এবং মুসলমানদের বিভিন্ন বিজয়াভিযানে লব্ধ অগণতি সম্পদ তাদের বানাল স্থূল আয়েশী। আর এ কারণেই তারা আলীর উপদেশে কর্ণপাত করল না, তাঁরা লক্ষ্যের এবং কঠিন পথের

কোন মূল্য দিল না। জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সে আস্থাতেই প্রীত হল। সমস্যা-সংকটময় জীবনের পথকে তারা আর পছন্দ করতে পারছে না। সে সকল ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন অনুভূতিই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ সকল মানুষ এখন সম্পদ ও শক্তির দাসে পরিণত হয়েছে। ব্যতিক্রম কিছু মানুষ যারা অবাধ্য হল তরবারীর জোরে তাদের বিষয়টি ফয়সালা করা হল।

আলীরই শাসনামলে, তাদের নিজস্ব শহর মদীনার বুকে, তাদের আপন বন্ধু ও সাহাবাগণের দ্বারা আলী ও ফাতিমার জীবনে কি ঘটেছে এটা কি আপনাদের স্মরণে নেই? অথচ সে সকল সাহাবারাত সমান মর্যাদা নিয়ে একই সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন।

আপনারা জানেন উমাইয়া গোত্রের লোকেরা মদীনা অথবা সাকিফাতে বসবাস করতেন না। নির্বাচনী কমিটিতে তাদের কোন সদস্য ছিল না। আপনি হজরত আলী এবং ইমাম হাসানের বিশিষ্ট কর্মচারীদের অতীত ঐতিহ্যের দিক লক্ষ্য রেখে তাঁদেরকে স্মরণ করেন? তবে কেন তাঁরা নিজেদেরকে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে মুয়াবিয়ার নিকট বিক্রয় করল? কি করে তাঁদের পক্ষে মুয়াবিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করা সম্ভবপর হয়? কি করে তারা তাদের অতীত মর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ জলাঞ্জলি দেয়?—তাঁদের অধীনস্থ সৈনিকরাই বা কি করে সবাই মুয়াবিয়ার আজ্ঞাবহ হয়।

খারেজীরা উমাইয়া গোত্রের কোন অংশ নয়, নয় তারা উমাইয়া শাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাদের অনেকেই'ত উমাইয়াদের রক্তের দুশমন এবং তাদের রাজত্বের বিরোধী ছিল। তারা সবাই ছিল সাধারণ কাতারের মানুষ, সাধারণ গ্রাম্য ব্যবসায়ী। পবিত্রতা, ধার্মিকতা ও নিবেদিতপ্রাণের নিদর্শন আধ্যাত্মিক সাধকগণও ছিলেন। তারা ছিলেন কট্টরপন্থী ধর্মানুরাগী জনপ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি করে তারা অজ্ঞাতসারে উমাইয়াদের স্বার্থোদ্ধারের যন্ত্রে পরিণত হল। দামেস্কের পরোক্ষ প্ররোচনায়ই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং আলীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধের সংকট মুহূর্তে তারা আলীর সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হন এবং আলীকে একা রেখে ময়দান ত্যাগ করে। সুতরাং তারা দুশমনের অবৈতনিক কর্মচারী হিসেবে আলীকে পরাজিত করার কাজে ব্যবহৃত হল। অথচ তারা সে সব

উত্তম স্বভাবের ধার্মিক লোক যারা নানা অভিযোগ উত্থাপন করে, নানা ব্যঙ্গাত্মক বিষয় রটনা করে আলীকে বিপর্যস্ত করে তুলে। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মহীনতা ও বিচ্যুতির অভিযোগ আনয়নেও কুণ্ঠিত হয়নি এ সব লোকেরা।

আমর ইবনুল আসের মত নামী সর্বজন পরিচিত লোকেরা আলীর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সুনাম বিনষ্ট করতে না পেরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। আমরা এটা' জানি কি করে তারা নিজস্ব লক্ষ্য এবং গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে শেষাবধি তাঁকে হত্যা করে। এ সকল অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, "কি করা কর্তব্য।" "কিছুই নয়।" এ সকল লোকদের জন্যে মুয়াবিয়াই উপযুক্ত। আলী নয়। পক্ষান্তরে, এ' সকল দুর্বলতা ও বিচ্যুতির বিষয় বিবেচনা করে গৃহীত পদক্ষেপের দৃষ্টিতে বিচার করলে বুঝা যায় মুয়াবিয়াই ছিল আধুনিকতম চিন্তার ধারক, আলী নন। আলী চেয়েছিলেন জনসাধারণ পরহেজগারীর সরল-সাধারণ জীবন যাপন করুক যা' অসম্ভব। কিন্তু মুয়াবিয়ার রাজত্ব, যদিও এটা নিপীড়ন, দুর্নীতি এবং বৈষম্যমূলক ছিল তথাপি সেটা সমাজকে স্তরতর উন্নত করেছে। এর মুক্ত এবং বন্ধনহীন শাসনের আভ্যন্তরীণ শক্তি ইরানী এবং রোমীয় সভ্যতার সকল পদ্ধতি ও প্রকৃতিকে অনুসরণের সহায়ক হয়। মুয়াবিয়ার শাসনের বিশ বছর প্রথমতঃ তিনি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অনৈক্য এবং আবুজর, আলী, হাসান, হাজর প্রমুখের বাধা দূর করলেন অতঃপর ইসলামী দুনিয়ার রাজধানীকে তিনি আধুনিক উন্নত, পশ্চিমা ধাচের শহরে রূপান্তরিত করেন। ভূমধ্যসাগরে তিনি নৌসেনা-বাহিনীর একটি ঘাঁটি তৈরী করেন, জয় করেন সাইপ্রাস এবং পূর্বাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্যের স্থায়ী হামলা প্রতিহত করেন।

মুয়াবিয়ার সবুজ প্রাসাদ রোমীয় স্থাপত্য শিল্পের ঐতিহ্য অনুসরণ করে তৈরী আর একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে সাসানীয় পদ্ধতিতে। আরবীয় কিছু বেদুঈন ভৃত্যের পরিবর্তে এখন তিনি একটা বাদকদল জন্ম দেন যেখানে ইরানী বাদকরাসহ রোমীয় নর্তকীরা অন্তর্ভুক্ত। তিনি সীজার ও ইরান রাজদের কল্পনাবিহারী রাজদরবারের ঐতিহ্য এবং প্রথাকে অনুসরণ করেন। পোশাকাদি, খাদ্য, চিত্তবিনোদন, সাজসজ্জা, বাদ্য-বাজনা, কবিতা, সাহিত্য, জীবন-যাপন প্রণালী, নগর-পরিকল্পনা, প্রাসাদসমূহ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছু আরবের আদি ও সরল

পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক সভ্য এবং বিপ্লবী রোমান পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হয়।

আমরা যদি সত্য-মিথ্যা, অত্যাচার, ইনসাফ, আলী সঠিক পথে, না মুয়াবিয়া সঠিক পথে আছে এ' সব প্রশ্নের ঊর্ধে উঠে দৃশ্যমান উন্নতি এবং সভ্যতার আলোকে বিচার করি দেখা যাবে তিনি অনেক কিছুই করেছেন এবং করে চলছেন। যা'ক রাজধানী শহরের আধুনিকীকরণ, মর্যাদা ও দরবারী সৌজন্যবোধের নিয়ম-নীতির প্রচলন, খলিফার উন্নতমানের জীবন যাপন এবং উন্নততর প্রাসাদ সবই বিদেশী খৃস্টান ও ধর্মযাজকদের মধ্যে ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

তা'ছাড়াও হযরত আলী অনুসৃত সাবেকী ব্যবস্থা রোমান ও ইরানী শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে তারা বলে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, উমাইয়া খেলাফতের নতুন ব্যবস্থা জনগণকে অধিকতর সেবা করছে এবং সেটা অধিকতর উপযোগী বলে অনুভূত হচ্ছে। তারা জনগণকে এমনি আচরণ শিক্ষা দিল যাতে এ ধারণা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় যে, উত্তম জিনিস হবে গতিশীল এবং মুক্ত। সেগুলো অবশ্য ইসলামের জন্যে সম্মান, শক্তি, যুদ্ধাজিত সম্পদ, কল্যাণ, বিজয়, বিস্তৃতি, সুনাম এবং গুরুত্ব বৃদ্ধির ধারণা সৃষ্টি করে। অনেক মন্দির ও গীর্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। অপবিত্র ভূ-খণ্ডের অনেক নগর ও শহরে, যেখানে আল্লাহু আকবর (আল্লাহ শ্রেষ্ঠ), 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই) এবং 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' (মুহাম্মদ আল্লার রসূল) ধ্বনি আজ উচ্চারিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অনেক সম্পদ ও যুদ্ধলব্ধ অর্থ জমা হয়েছে। যদিও সে সকল সরকারী তহবিল যথাযথভাবে সংগৃহীত (ইসলামী শরীয়তানুযায়ী) হয়নি কিন্তু সে'গুলোত ইসলামী রাষ্ট্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্ততঃ কিছু কিছু মুসলমান'ত এর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে। উপরন্তু এ সকল বিজয় মুসলমান যুবকদের জন্যে নতুন নতুন পেশা এবং আয়ের উৎস সৃষ্টি করে এবং কিছু কিছু মুসলমানদের জন্য উচ্চ মর্যাদা ও চাকুরির ব্যবস্থা করে দেয়।

সুতরাং কি করা উচিৎ'? প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন, "নবী করীম (দঃ)-এর জামানার আদর্শবাদী বিপ্লবী ইসলামের মানদণ্ডের বিষয়টি পুনবিচার করে দেখতে হবে। কালান্তর ঘটেছে, আজ ইসলাম শুধু মক্কা-

মদীনা কেন্দ্রিক নয়। বাইজানটাইন থেকে ইরান পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। এ জন্যে আলীর পূর্ণ ন্যায়বিচারমুখী কঠোর ঝুঁকিপূর্ণ ভাববাদী ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হলে চলবে না। মুয়াবিয়ার পথে ধাবিত হল তারা। একজন সীজার বা রাজার দ্বারা শাসিত হতে যারা মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত তাদের কাছ থেকে এমন কঠোর পথের অনুসরণ আশা করা যায় কি?

"আপনাকে অবশ্যই বাস্তবতার আলোকে বর্তমান পরিস্থিতির বিচার করে দেখতে হবে। স্বীকার করতে হবে যে উমাইয়াদের রাজশক্তি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ, এবং সেনাশক্তি ইসলামের নামেই কাজ করছে। ইসলামের রীতিনীতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলামের বিস্তার ও উন্নতি ঘটাতেই সেগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। এ খেলাফত'ত বাতিল ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, ইসলামের সুনাম বৃদ্ধি করছে, কোরআন এবং রসূল (দঃ) কে সম্মুখে রেখেই'ত এগুচ্ছে। এ শাসন ইসলামী সমাজে উন্নততর সভ্যতা বিকাশের চেষ্টা করছে, নগরসমূহের উন্নয়ন, জীবন ধারণের মানের উন্নতি, সমাজ কল্যাণ সাধন, সম্পদ বৃদ্ধি এবং প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মহান সভ্যতাদ্বয়কে ইসলামের সঙ্গে সমন্বিত করেছে।

সুতরাং 'কি করতে হবে' এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে বর্তমান যা' দাবী করে তাই আমাদের করতে হবে—উমাইয়া সরকারে প্রবেশ করতে হবে। আমরাত হস্তক্ষেপ, গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক সংগ্রাম, সত্যের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক বিতর্ক, ইনসাফ, ইমামত, অনুমোদন, নির্বাচন, গুণাবলী, ধার্মিকতা, পবিত্রতা, ঐতিহ্যাবলী, কেয়াছ, উত্তরাধিকার সবই প্রত্যক্ষ করলাম—সবই'ত অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হল এবং পরাজয় ডেকে আনল।

আরো বলা যায়, উমাইয়া খলিফা যখন ইরানে ও রোমের খৃষ্টানাবাদ ও পৌরহিত্যবাদের বিরুদ্ধে এবং বাতিলপন্থী ও বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত সে মুহূর্তে অন্তঃবিপ্লব ঘোষণা ইসলামী সরকারী শক্তিকে দুর্বল করে দেবে। তাই এটা কোন সৎ উপদেশ নয়। এটা শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের উন্নতিই ব্যাহত করবে।

বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিহার করতে হবে, নিঃসঙ্গতা, সুফিবাদ, এবং ধার্মিকতার পথকে অবলম্বন করতে হবে। বাস্তবতার দৃষ্টিতে উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী যেহেতু ইসলামী জনতার সেবা করছে তজ্জন্যে তার প্রতি সমর্থনদানের চেষ্টা করতে হবে।

বিচ্যুতির প্রশ্নে—আমাদের চেষ্টা করা উচিত তাদের সংশোধন ও পরিবর্তন করার। আমরা কিভাবে আমাদের দায়িত্ব আনযাম দিতে পারি? বলাবাহুল্য যে, ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রেখেই আমরা তা' করতে পারি।

একদিকে আমরা জনতার সেবা, নিপীড়িত মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, সামাজিক কাজের দায়িত্ব, দুস্থ মানুষকে সাহায্য, ধর্মীয় তৎপরতা বৃদ্ধি এবং প্রচারণার কাজ, ধ্যান ধারণার উন্নতি, সমাজ-সংস্কার, শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ভবিষ্যত দুর্নীতি বন্ধের চেষ্টা, গুরুত্বপূর্ণ পদ ও পেশালাভের তদবীর চালাতে পারি।

অপরদিকে, বিশেষজ্ঞগণ এবং শিক্ষিত লোকেরা বলেন, "হিজরতের পর ষাটটি বছর অতিক্রম হয়েছে। আলীর বিপ্লব বিফল হয়েছে। হাসান হচ্ছেন সর্বশেষ নেতা যিনি অত্যাচার, রক্ষণশীলতা, পুরাতন ঐতিহ্য যেগুলো জনস্বার্থের এবং ঐশীবাণী বিরোধী তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে মুয়াবিয়ার সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছে এবং মুয়াবিয়ার নির্দেশে তাঁর ওপর বিষপ্রয়োগ করা হয়। অতএব কিছু করা যাবে না। এটি অর্থহীন। আমাদের উচিৎ শুধু ধর্মীয় সমস্যা, ধর্মীয় ন্যায়শাস্ত্র, গবেষণা, আধ্যাত্মিক সাধনা ইত্যাদি ধরনের কাজে অংশ গ্রহণ করা। এবং উক্ত সব মাধ্যম ব্যবহার করে জনগণকে ইসলামী চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা দান এবং তাদের সম্মুখে এর বাস্তবতা, আধ্যাত্মিক দিক ও কোরআনের বৈজ্ঞানিক রহস্য উপস্থাপনার চেষ্টা করা।

আমাদের উচিত সে ধরনের গবেষণায় লিপ্ত হওয়া যা আমাদেরকে ঐশ্বরিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে নিমজ্জিত রাখবে এবং কাল্পনিক দর্শন, কোরআনের গোপন বিষয়, অলংকার শাস্ত্র, বাগ্মিতা, তাৎপর্য অনুধাবন, ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ, উদ্ভাবন, প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মতবাদ, সভা-সমিতি, কোরআন সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, জ্ঞানদান, হাদীস লিপিবদ্ধকরণ, নবী (দঃ) এর আচারব্যবহারের ওপর অধ্যয়ন, ইসলামী জিহাদসমূহ, ফিকা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে আত্মনিয়োগ করা। ধর্মীয় জ্ঞানের ভিত্তি গবেষণাকর্ম, প্রশিক্ষণ ও প্রচারণার কাজে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। ইসলামী রীতি-নীতি এবং এর ভূমিকা, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ, ইসলাম ও ইসলামী সমাজের সেবা এসব বিষয়ের ওপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এসব

করতে হবে পূর্ণ আন্তরিকতাসহকারে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে, এসব ভিন্ন অন্য কিছুই আমাদের করণীয় নেই।

ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে যে, আলীর অনুসারী বুদ্ধিজীবীরা এমনকি আলীর পরিবারের অনেকে যারা নবী (দঃ) এর পরিবারের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক রাখে, যারা বনী হাশেমের অন্তর্ভুক্ত তারাও কিন্তু 'কি করতে হবে' এ প্রশ্নের জওয়াবে 'কিছুই নয়!' সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন কেননা তারাও যেন স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন যে বিরোধী কোন পদক্ষেপ পরাজয়ই ডেকে আনবে। কিছুই করা যাবে না, এ যেন কেইন ও আবিলের গল্পের মত অবস্থা। খালি হাতে তরবারীর সম্মুখীন হওয়া বিধানসম্মত কোন কাজ নয়। এর অনুমোদন নেই। এ নিষেধ অনুসরণ করাও দায়িত্ব নইলে শাস্তি পেতে হবে। এটা কি বলা হয়নি, "নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করো না।" মৃত্যুই যে জিহাদের নিশ্চিত পরিণতি সেখানে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হওয়া অর্থই হচ্ছে আত্মহত্যা। এ' ধরনের কাজ বাতিলপন্থী এবং অত্যাচারীর জন্যে সহায়কই প্রমাণিত হবে। এটা অর্থহীন।[৩]

তাঁরা তাঁকে উপদেশ প্রদান করলেন নীরবতা অবলম্বন, জনগণকে প্রশিক্ষণ দান কাজে অংশগ্রহণ, কোরআন শিক্ষা দেয়ার, ফিকা শাস্ত্রের উন্নতিকরণ এবং নবী (দঃ) এর সুন্নাহ উজ্জীবনের কাজ সম্পাদন করতে।

এভাবে আমরা দেখছি, ক্ষমতাসীনগণ থেকে আরম্ভ করে ধার্মিক মানুষেরা, বিদ্বজ্জনরা, এমন কি 'শিয়া' তথা সে সকল বুদ্ধিজীবীরা সত্যকে যারা বুঝতে পারছিলেন, যারা শাসকচক্রের সামাজিক, মানসিক এবং রাজনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন, তারা সবাই হিজরতের এ ষাট বছর পর পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলেন 'না'।

একটি মাত্র সঙ্গিহীন মানুষ বলছিলেন 'হাঁ'। সে 'হাঁ'টি কি? সম্পূর্ণ অক্ষমতা, দুর্বলতার বিরুদ্ধে একটি জবাব, সে সময়ে যখন বিরাজ করছিল ঘোর তমসা, অসহনীয় নীরবতা, চলছিল অত্যাচার আর স্বৈরশাসন। এ জবাব এসেছিল এমন এক সচেতন এবং সত্যনিষ্ঠ বিশ্বাসী মানুষের পক্ষ থেকে তখনও যার মধ্যে জিহাদের দায়িত্বানুভূতি বিরাজ করত। এটা হচ্ছে ইমাম হোসাইনের উক্তি: 'হাঁ'! তাঁর এ অক্ষমতার মধ্যেও রয়েছে একটা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যবোধ। তাঁর আকাংখা ছিল আদর্শ এবং জিহাদের মধ্যে বেঁচে থাকা।

এ জন্যে যদি তিনি বেঁচে থাকেন বা বাঁচতে চান আদর্শের জন্যে তাঁকে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। একজন প্রাণময় মানুষ অবশ্যই দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন হবে, সক্ষম ব্যক্তি নয়। আর হোসাইন ( রাঃ ) হতে কে অধিকতর প্রাণময় হতে পারে ? আমাদের ইতিহাসে বেঁচে থাকার ব্যাপারে হোসাইন ভিন্ন কারই' বা অধিকতর অধিকার এবং যোগ্যতা আছে ?

মনুষ্য-আত্মা সচেতন হয়ে ঈমান পোষণ করে প্রাণময় হয়ে মানুষের মধ্যে জিহাদের দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে। আর হোসাইন হচ্ছেন প্রাণময়, আত্মনিবেদিত ও মনুষ্যত্ববোধের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

ক্ষমতা-অক্ষমতা, দুর্বলতা-সবলতা, সঙ্গিহীনতার সংখ্যাধিক্য শুধুমাত্র মিশনের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব পালনের পন্থা নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করতে পারে না।

তাঁকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু তার সেনাবাহিনী নেই। তথাপি তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে সংগ্রাম করা। হোসাইনের উত্তর হচ্ছে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রেরণার নির্দেশ এবং তিনি একমাত্র 'হাঁ' মতামতের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি সে' সংকট মুহূর্তেও যিনি বলেছেন 'হাঁ'। সম্পূর্ণ একা তিনি। তিনি মদীনার নিজস্ব আবাসস্থল ত্যাগ করলেন। ইমাম মদীনা থেকে মক্কায় গেলেন কেননা সেটা ছিল হজ্জের মৌসুম। কাবার আশেপাশে তখন সে' সব জনতার ভীড় যারা 'হাঁ' বলার জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এখন তিনি মক্কা ত্যাগ করছেন। ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে তাঁকে। তাঁর হজ্জের অর্ধেক সময় অতিক্রম হয়েছে দুনিয়াবাসীকে 'কি ভাবে' এটা বুঝাবার জন্যে। হিজরতের ষাটটি বছর অতিক্রান্ত, নবী (দঃ)-এর তিরোধানের পরও অতিক্রম হয়েছে পঞ্চাশটি বছর। সবকিছু হারিয়ে গেছে। আলী নেই, হাসান নেই, নেই আবুজরও। আম্মারও দৃশ্যান্তরালে। দ্বিতীয় বংশধরগণের মধ্যে হাজরও নেই এবং তাঁর সাথীরা সবাই বিগত। ফাঁসির রজ্জু খুলে নেয়া হয়েছে রুধীর ধারা মুছে গেছে।

ধ্যান-ধারণা, আদর্শ অদৃশ্য, অন্ধকারময় হয়েছে। আদর্শিক অবনতি, বিচ্যুতিই বিরাজ করছে। বিরাজ করছে নীরবতা ও ভীতি। সর্বত্র তমসা ছড়িয়ে পড়েছে। আবু হরাইরা, আবু মুসা, সুহরাইল, আবু দারদা এবং

তাঁদের সমতুল্য অন্যরা যারা ইসলামী বিপ্লবের সে উজ্জ্বল দিনগুলোতে সে মর্যাদা লাভ করেছেন বাতিল স্বৈরাচারী শক্তি তাঁদেরকেও আনুগত্য করতে বাধ্য করল।

মুজাহিদবৃন্দ, সাহাবাগণ এবং হিজরতকারীদের অনেকেই সরকারী কোষাগার থেকে সাহায্য নিতে বাধ্য হল। যে সকল হাত ও অস্ত্র ছিল জিহাদের পক্ষে সেগুলো হস্তান্তরিত হল হত্যাকারীদের কাছে। প্রয়োজন ও দুর্বলতার ছদ্মাবরণে সবাই ইয়াজিদের চতুষ্পার্শ্বে সারি বাঁধল। দামেস্ক থেকে খোরাসান পর্যন্ত সর্বত্রই তথাকথিত নিরাপত্তার রক্তলোলুপ তরবারির ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। স্বদল ত্যাগ, পরাজয়, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, দায়িত্ব এড়ান এবং গভীর হতাশার নিচ্ছিদ্র আঁধার সাম্রাজ্যের সর্বত্র মৃতবৎ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। শ্বাসবায়ু বন্দী হয়ে পড়েছিল পাঁজরার মধ্যে।

নিষ্প্রাণ শহরের সমাধি গাহে
পেচকের ডাকও যায় নাকো শুনা
ব্যথিত চিত্ত নীরবে সহে
নিভৃতে কাঁদে সব বিক্ষুব্ধ জনা।
যোদ্ধার দৃঢ় মুষ্টি আজ শিথিল
সে বীর বাহু অবনমিত আজ চরমভাবে
প্রকাশ্য বা গোপনে সব বুজদীল
ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করে সবে।
নীরব শহরের সমাধি গাহে
ফাঁসির রজ্জুতে পচন ধরেছে আজ
রুধীর ধারা আর নাহি বহে।
সেখানে বিক্ষোভ ঘৃণার চারাগাছ
মস্তক করেছে উন্নত, জন্মেছে আগাছা
আর আছি মোরা প্রবঞ্চকের রাজা।

এখন এ যুগসন্ধিক্ষণ একটি মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে। এহেন পরিবেশ ও পরিস্থিতি এমন একজনের প্রত্যাশা করছিল যিনি সকল মূল্যবোধ যেগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল এবং সে সকল বিধি বিধানের নিদর্শন যেগুলো নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত হয়েছিল সেগুলোর উত্থান ও সমন্বয় সাধনের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন। এ সকল আদর্শ ও বিশ্বাসের বিস্তারে যারা অভিলাষী

তারা দুশমনদের সঙ্গে ভীড়ে গেল। হাঁ—সময় একজন মানুষের সক্রিয়তাই দাবী করছিল। ইতিহাসের কোন কোন পর্যায়ে এমনটিই ঘটে থাকে। হিজরতের ষাট'টি বছর পর, মুক্তি, ইনসাফ ও মানুষের নবী (দঃ)-এর ওফাতের পরও অতিক্রম হয়েছে পঞ্চাশটি বছর। কাল পরিক্রমা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যখন সবকিছু পরিত্যক্ত। বিপ্লবের সকল উদ্দেশ্যই অবর্তমান। জনতার দৃঢ় ঈমান চরম হতাশায় আজ নিমজ্জমান।

হাঁ। এ অন্ধকার মুহূর্তে জাহেলিয়াতের অভিজাততন্ত্র আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতা আজ ধার্মিকতা ও পবিত্রতার আবরণে আচ্ছাদিত। স্বাধীনতা আর সাম্যের যে আকাংখা ইসলাম সৃষ্টি করেছিল ক্ষমতাসীন এবং তাদের গৃহীত পলেসীর কারণে তা' উবে যাচ্ছে। গোত্র পূজার জাহেলিয়াত মানবতার বিপ্লবের স্থান দখল করে নিয়েছে। সত্য কিতাবকে প্রতারণার বর্শাফলকের অগ্রভাগে ঝুলান হয়েছে। মসজিদের মিনার থেকে শ্রুত হচ্ছে বাতিলের আওয়াজ। স্বর্ণ-সাবক ঐক্যের আহবান শুনাচ্ছে। ইব্রাহীমের পরিবর্তে নমরূদ আত্ম প্রকাশ করেছে। সীজার করেছে আল্লাহর রসূলের টুপি পরিধান। হত্যাকারী জিহাদের অসি ধারণ করেছে। বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়েছে ঘুমের বড়িতে। বাতিলের বিরুদ্ধে তৎপরতা এবং মুজাহিদদের সংগ্রাম সব বাতাসে ভেসে গেল। এ সকলের পরিবর্তে মুনাফিকদের জন্যে সরকারী তহবিল বর্ধিত হচ্ছে। জিহাদ রূপান্তরিত হয়েছে ধ্বংসের মাধ্যমে। ধর্মীয় করসমূহ পরিণত হয়েছে আজ জনস্বার্থের ধ্বংসকারী। নামাজ ব্যবহৃত হচ্ছে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার মাধ্যম হিসেবে। ঐক্যকে ঢাকা হয়েছে প্রতারণাময় পোশাকে। ইসলাম আত্মসমর্পণের এক শৃংখলে পরিণত হয়েছে। নবী (দঃ)-এর সুন্নাহকে বানান হয়েছে কোরানিক বিধানের সমতুল্য। কোরআন হয়েছে জাহেলিয়াতের বাহন, নবী (দঃ)-এর হাদিসসমূহকে করা হয়েছে বিকৃত। তরবারির ঝলকানি স্কন্ধ লক্ষ্য করে আর একবার নেমে আসছে। জাতিসমূহকে পূর্বের মত আবার দাসত্বের রজ্জুতে বাঁধা হচ্ছে। স্বাধীনতা স্থায়ী শৃংখলের সঙ্গে একই তালায় আবদ্ধ। ধ্যান-ধারণা জেলখানায় বন্দী এবং নীরব হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ আত্মসমর্পণ করেছে। মুক্ত যারা তারা শৃংখলাবদ্ধ হয়েছে। শৃগালরা শোরগরম। নেকড়েদের আপ্যায়ন করা হচ্ছে। জিহবা হয় স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রিত নয় বলপ্রয়োগের দ্বারা স্তব্ধ অথবা ব্লেড দ্বারা কর্তিত।

সে ঈমান ও জিহাদের যুগে মহান বিপ্লবের সময়কালে কঠিন আত্ম-ত্যাগের বিনিময়ে যে সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল সেটা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে দেয়া হলো, কিংবা প্রাদেশিক শাসকের পদের মত পদ-লাভের জন্যে সেগুলো বরবাদ করা হলো। এ বিদ্রোহ করার ঝুঁকি তাঁরা পাশ কাটিয়ে গেল দায়িত্ববোধের ক্ষুব্ধ ভারমুক্ত করে। তাঁরা নিরাপদ কোণে আশ্রয় নিল, নিয়োজিত হলো সম্পূর্ণ অবসরময় আধ্যাত্ম সাধনায় যা' তাদের স্বাস্থ্যের জন্যে কল্যাণকর বিবেচিত হলো, বিবেচিত সম্মানজনক পথে নিরাপদ লাভের পন্থা হিসেবে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্বাক হয়ে, বাতিলের কাছে আত্মসর্পণ করে হকের আন্দোলনের ঝুঁকি তাঁরা সযতনে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিল। অথবা রাবেজার মরু প্রান্তরে কিংবা আজরা চারণভূমিতে তারা হলেন নিহত।

আজ ধর্ম এবং পৃথিবী ধাবিত হচ্ছে বাতিল ও উৎপীড়নের পক্ষে। অসি সব ভেঙে গেছে। কণ্ঠনালী কর্তিত, ফাঁসির রজ্জু পচে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। রক্ত গেছে মুছে।

বিপ্লবের তরঙ্গ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, বিদ্রোহের অনল সবই নিস্তেজ-নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। উত্তেজনা ও উৎসাহ অদৃশ্য হয়েছে। ভীতির ও রক্ত প্রবাহবন্ধের এক চাপের ছায়া সকল শহীদদের কবর গাহের উপর যেন বিরাজ করছিল, বিরাজ করছিল জীবন্তদের হীন শীতল নিষ্প্রাণ সমাধি গাহেও। মুসলমানদের ঈমান ও আশার ধ্বংসস্তূপে কোন পেচকের ডাকও শুনা যচ্ছে না।

জাহেলিয়াত পার্থিব স্বর্গকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে। পূর্বেকার জাহেলিয়াত থেকে এটা জঘন্যতর। এখানে পূর্বতনদের চেয়ে এ' দুশমনরা অধিকতর বুদ্ধিমান, বিজয়ী এবং সচেতন, অপর পক্ষে বুদ্ধিজীবীরা বিদ্রোহের ফল যা পরাজয় এনেছে শাহাদৎ যেখানে সফলতা আনেনি এসব কিছুর অস্তিত্বতা অর্জন করেছে।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা বিজলী চমকালো এবং নীরবতা ভেঙে চৌচির করল। চির-জাগ্রত যে শহীদের মুখাবয়ব তা সপ্রাণ বিচরণ করে পৃথিবীতে।' গহীন অন্ধকার, সীমাহীন দুর্নীতি এবং হতাশার ঘোর তমশার মধ্যে 'আশার' এক আলো এক শক্তিশালী নিদর্শন আবির্ভূত হল।

আবার একবার সে জীর্ণ কুটির যা সারা ইতিহাসে সর্বাধিক ঘটনাময়, ফাতিমার সে নিভৃত বিষাদাচ্ছন্ন গৃহ থেকে বের হলেন একজন মানুষ—

বিক্ষুব্ধ, দৃঢ় এবং সকল নির্দয়তার প্রাসাদ ও ক্ষমতাকেন্দ্রে যিনি বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করতে চান। তিনি হচ্ছেন সে পর্বত যেখানে লুক্কায়িত রয়েছে আগ্নেয়গিরি অথবা একটি ঝড় যা' মহাক্ষমতাবান আদম জাতির প্রতি নাজিল হয়েছিল।

ফাতেমার ( রাঃ ) গৃহ থেকে একজন আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন মদীনা ও মসজিদে নববীর দিকে, মক্কা, ইব্রাহীম এবং কাবার প্রতি যা নমরূদের করতলগত। তিনি লক্ষ্য করেন ইসলাম এবং মুহাম্মদ ( দঃ ) এর নির্দেশের দিকে দামেস্কের সবুজ প্রাসাদ, ক্ষুধার্ত মানুষ, দাসগণ ইত্যাদির প্রতি তাকালেন।

ফাতিমা (রাঃ) এর গৃহ থেকে একজন অগ্রসর হলেন। সকল দায়িত্বের বোঝা আজ তাঁর স্কন্ধে আরোপিত। মনুষ্য সমাজের বৃহত্তর নির্যাতিত অংশের তিনি উত্তরাধিকারী। তিনিই শুধু আদম, ইব্রাহীম, মুহাম্মদ— সবার একমাত্র উত্তরসূরী-সম্পূর্ণ একা।

কিন্তু না। ফাতিমার আলয় হতে একজন মহিলাও তাঁর সঙ্গে বের হলেন পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তিনি তাঁর ভ্রাতার অর্ধেক দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে ভাগ করে নিলেন।

একজন মানুষ ফাতিমার বাটীকা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। একাকী, বন্ধুহীন, সম্পূর্ণ শূন্য হাতে তিনি সন্ত্রাশ, অন্ধকার এবং তরবারির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছে একটিই অস্ত্র ছিল – মৃত্যু। কিন্তু তিনি হচ্ছেন সে পরিবারের সন্তান যাঁরা আদর্শের জন্যে কিভাবে মরতে হয় তা' জ্ঞাত। সারা দুনিয়াতে কেউ নেই যে, কি করে মরতে হয়' এ বিষয় তাঁর চেয়ে ভাল জানে। তাঁর শক্তিধর দুশমন যে পৃথিবী শাসন করছে এ জ্ঞান হতে সে বঞ্চিত ছিলেন না। এ নিঃসঙ্গ বীর যেহেতু শত্রুর মহা প্রতাপশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয় পোষণ করতো সে জন্যে তিনি দৃঢ়ও হয়েছিলেন। তিনি এ শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন সন্দেহাতীত ভাবেই।

শাহাদতের এ মহান প্রশিক্ষক সক্রিয় হলেন সে সকল লোকদের শিক্ষা দিতে যারা ভাবতো ক্ষমতা থাকলেই জিহাদ করতে হবে এবং যাদের ধারণা ক্ষমতা দখল করার মধ্যেই বিজয় নিহিত। শাহাদত কোন ক্ষতির কারণ

নয়, এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত, একটা সিদ্ধান্ত, যার কারণে একজন সংগ্রামী স্বাধীনতার স্তম্ভের প্রান্তে আত্মোৎসর্গ করে, প্রেমের বেদীতে দেয় আত্মাহুতি এবং লাভ করে বিজয়।

আদমের বংশধর হোসাইন যিনি মনুষ্য সন্তান এবং শ্রেষ্ঠতম নবীর উম্মতদেরকে এতদিন 'কি করে বাঁচতে হবে' তাঁর শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন। তিনি এখন তাদেরকে 'কি করে মরতে হয়' এ শিক্ষাদানের জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন।

হোসাইনের শিক্ষা, 'ঘৃণিত মৃত্যু' একজন মহৎপ্রাণ মানুষের জন্যে বড়ই করুণ—সেত বেঁচে থাকার জন্যে ঘৃণিত পথকে বেছে নিয়েছে। মৃত্যু তাদেরকেই ডাকে যারা শাহাদাতের পথকে বেছে নিতে সাহসী নয়। মৃত্যু তাদেরই চায়।

শহীদ শব্দটি যা' আমি বলতে চাই তা' হচ্ছে 'আত্মোৎসর্গের' এটি সর্বোচ্চ পর্যায়। এর অর্থ হচ্ছে উপস্থিত হয়ে, সাক্ষ্য বহন করা বা যে সাক্ষ্য দেয়। এর আর এক অর্থ সজ্ঞান এবং আদর্শবোধসম্পন্ন। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি বুঝায় আদর্শ, ধরন, উদাহরণ।

শাহাদত : 'জাগ এবং সাক্ষ্য দাও' কথাটি আমাদের সংস্কৃতিতে ও ধর্মে রক্তক্ষয়ী এবং দুর্ঘটনামূলক কিছু নয়। অন্যান্য ধর্মে এবং গোষ্ঠীর ইতিহাসে মার্টার হচ্ছে সে সকল বীরদের আত্মবিসর্জন যারা দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এটাকে বিবেচনা করা হয় একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা হিসেবে যা সম্পূর্ণ করুণ। যারা এভাবে নিহত হয় তাদেরকে 'মার্টার' বলা হয় এবং তাদের মৃত্যুকে বলা হয় মার্টারডম।

কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতে মার্টারডম অর্থ মৃত্যু নয় যে মৃত্যু দুশমন ধর্মযোদ্ধার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এটা হচ্ছে একটা মৃত্যু যা' আমাদের মুজাহিদদের কাম্য যা' তারা লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে সচেতনতা, যুক্তিতর্ক, কার্যকারণ, প্রজ্ঞা, বোধশক্তি, আত্মোপলব্ধি এবং সে সতর্ক মানসিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যা' মনুষ্যজীবের মধ্যে বিরাজ করছে।

হোসাইনের দিকে লক্ষ্য করুন। জীবন থেকে তিনি অব্যাহতি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন নিজের শহর এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন, কেননা

দুশমনকে ঘৃণিত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বঞ্চিত প্রমাণ করার সংগ্রামের জন্যে তাঁর কাছে কোন উপকরণ ছিল না। শাসকগোষ্ঠীর কুৎসিত চেহারা যে পর্দা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে সেটিকে সরিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে তিনি এ' পথ বেছে নিয়েছেন। শত্রুদেরকে এভাবে যদিও তিনি পরাজিত করতে পারবেন না কিন্তু কমপক্ষে এতটুকু পারবেন যাতে তাদের ঘৃণিত মুখাকৃতি জনতার সম্মুখে প্রকটিত হয়ে উঠে। যদি তিনি ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে জয়ী হতে নাও পারেন তবে অন্ততঃ নবী (দঃ)-এর প্রতি যে বৈপ্লবিক দায়িত্ব আরোপিত হয়েছিল সে বিপ্লবের দ্বিতীয় বংশধরগণের মৃতবৎ দেহে শোণিত সঞ্চার করে এবং জিহাদের বিশ্বাস জাগিয়ে সে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারেন।

অস্ত্রহীন তিনি, ক্ষমতাহীন এবং একাকী মানুষ। কিন্তু এমনি মুহূর্তেও জিহাদের দায়িত্ব তার ওপর আরোপিত। মৃত্যু ছাড়া তাঁর সম্মুখে কোন পথ নেই। তাঁকে আহবান জানাতে হচ্ছে একটি 'রক্তিমাভ মৃত্যুর।' হোসাইন হওয়ার কারণে দুর্নীতি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জিহাদ করার দায়িত্ব তাঁকে বহন করতেই হচ্ছে। তাঁর সে জিহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর এখতিয়ারে কিছুই ছিল না, ছিল শুধু মৃত্যু। সেটাকেই তিনি বেছে নিলেন এবং গৃহত্যাগ করলেন, প্রবেশ করলেন বধ্যভূমিতে।

আমরা দেখছি, নির্ভুল পরিকল্পনা, কার্যকারণ বিবেচনা, অত্যুজ্জ্বল সঠিক সুপরিকল্পিত বিদায়, আন্দোলন এবং হিজরতের মাধ্যমে কত সুন্দরভাবেই না তিনি এ দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে তিনি তার পথকে স্পষ্ট করে তুলছেন, যে 'ঈপ্সিত লক্ষ্যে' তিনি এগুচ্ছেন সে বিষয় ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, অদ্ভুত তাঁর সাথী নির্বাচন, অকল্পনীয় তাঁরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে আত্মাহুতি দিতে এসেছেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। এসব হচ্ছে তাঁর পার্থিব সম্পদ যা' তাঁর আয়ত্তাধীন রয়েছে এবং যেসব তিনি শাহাদতের বেদীতে আত্মোৎসর্গের জন্যে এগিয়ে দিচ্ছেন।

বিশ্বাসের ভাগ্য যা' আজ বিপর্যস্ত এবং সে সকল লোকের ভাগ্য যারা ইসলামী ইনসাফ ও মুক্তির স্বপ্ন দেখছিল কিন্তু এখন তারা জাহেলিয়াতের সমসাময়িক অত্যাচার এবং চাপ হতেও নিকৃষ্টতর অত্যাচার ও চাপের মধ্যে নিষ্পিষ্ট তারা আজ তাঁর কর্মতৎপরতার জন্যে অপেক্ষা করছে।

যাঁর নেই অস্ত্র, না আছে কোন উপকরণ তিনি এলেন তাঁর সমগ্র সত্তা নিয়ে, সম্পূর্ণ পরিবার, তাঁর প্রিয়তম সঙ্গীদের নিয়ে এ জন্যে যে, তাঁর নিজের এবং পুরো পরিবারবর্গের শাহাদত এ' সত্যের সাক্ষ্য দিবে যে, ইসলাম যখন নিরাপত্তাহীন, অরক্ষিত সে মুহূর্তে তিনি নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তিনি সাক্ষ্য দেন যে এমনি মুহূর্তে এর চেয়ে অধিক কিছু করার নেই।

আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, দশই মুহাররম আশুরার যুদ্ধে ইমাম হোসাইন (রাঃ) শিশু আছগারের কণ্ঠদেশ থেকে বহির্গত রুধীর ধারা হাতে নিয়ে বেহেশতের দিকে তা' নিক্ষেপ করে বলেন, "লক্ষ্য কর। আমার এ' বিসর্জন গ্রহণ কর। হে আমার প্রভু, আমার পক্ষে সাক্ষী হও।"

এটি হচ্ছে এমন একটি সন্ধিক্ষণ একজন মনুষ্য সন্তানের 'মৃত্যু' যখন একটি জাতির 'জীবনের' নিশ্চয়তা বিধান করে। তাঁর শাহাদত একটি মাধ্যম যার দ্বারা বিশ্বাস বেঁচে থাকতে পারে। মারাত্মক অপরাধ, প্রতারণা অত্যাচার এবং স্বৈরশাসন যে চলছে এটা তারই সাক্ষ্য বহন করছে। এটা প্রমাণ করছে যে সত্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে। যা' ধ্বংস ও বিস্মৃত হয়েছিল সে মূল্যবোধের আবির্ভাব ঘটাচ্ছে এটি। কাল সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এটা হচ্ছে এক রক্তাক্ত প্রতিবাদ। যে নীরবতা জিহ্বাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে সেখানে এটি একটি বিক্ষুব্ধ চিত্তের চিৎকার ধ্বনি।

যারা ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে থাকতে চাইছে শাহাদত হচ্ছে তাদের জন্যে সাক্ষ্য। এটা হচ্ছে তারই নিদর্শন যার অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক। ঐ নীরবতায়, এ' রহস্যময় সময়ে যা' কিছু ঘটছে তার সাক্ষ্য বহন করছে এটি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐ শাহাদত হচ্ছে বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ, উপস্থিতির একমাত্র লক্ষণ, আক্রমণ ও নিরাপত্তার একমাত্র মাধ্যম এবং প্রতিরোধের একমাত্র পন্থা এ জন্যে যে, অপব্যয়, মিথ্যা ও নিপীড়নের যে শাসন চলছিল সে সময়েও যেন সততা, ন্যায় বিধান এবং ইনসাফ টিকে থাকতে পারে।

তিনি সকল ভিত্তির ওপর বিজয়ী হয়েছেন। তিনি বিপর্যস্ত করেছেন সকল আত্মরক্ষাকারী এবং বিশ্বস্ত অনুসারীদের। 'মনুষ্য জীব হয়ে' অবরুদ্ধের যাঁতাকলের বিরুদ্ধে এবং চিরতরে মারা যাওয়ার বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে। এ সকল ধরনের বিস্ময় বাস্তবায়িত প্রশ্নে শাহাদতের জাগ্রত হচ্ছে এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে এর দ্বারা।

হিজরতের ষাটটি বছর অতিক্রম হয়েছে, একজন পরিত্রাণকারীর আবির্ভাব হওয়া এবং এ কালো নীরব সমাধিগাহে তাঁর উদয়ন অত্যাবশ্যক। এবং হোসাইন যিনি নিজস্ব রায় সম্বন্ধে সচেতন, মানবতার ইতিহাসের এ' ঘৃণ্যতম ঘটনার কারণে যা' তাঁর স্কন্ধে চেপেছে সে জন্যে নির্দ্বিধায় মক্কা ত্যাগ করলেন এবং তাঁর শাহাদতের স্থানটির দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি জানেন ইতিহাস তাঁর জন্যে প্রতিক্ষারত। প্রতিক্রিয়াশীল ও ফাসিকদের আয়ত্তাধীন যে সময় সেটি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে যেন অগ্রগতির পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

জনতা যারা বিজিত নিষ্প্রাণ এবং নিথর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ তারা তাঁর কাছে একটা আন্দোলন এবং আহবানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ফল কথা, যে মিশন ইবলিসের হস্তগত সেটি নির্দেশ দেয় তাঁর মৃত্যুর এ জন্যে যে এটির সাহায্যে তিনি ধ্বংসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হতে পারেন। বলা হয়ে থাকে নবী (দঃ) তাঁকে বলেছেন ঃ "প্রভু চান তোমাকে নিহত দেখতে।"

আমাদের মানবিক দর্শনেও শাহাদতের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ঐশ্বরিক এবং শয়তানী শক্তির সমন্বয়ে, আত্মা এবং জড়ের সংমিশ্রণে, নিম্নতম মান থেকে উচ্চতম মানের গুণাবলীর সম্মিলনে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি। ধর্মীয় উপাদানসমূহে এবং এর আবৃত্তি, নিবেদিত-চিত্ততা, প্রার্থনাসমূহ, ন্যায়শাস্ত্র, সুকৃতি, সেবাকর্ম এবং এসব কিছু – সে সংগ্রাম ও সাধনা যা' মানুষ তাঁর ইতর সত্তাকে দুর্বল করে উচ্চতর সত্তাকে সম্মুন্নত করার জন্যে এবং শয়তানী জড় সত্তাকে ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক অংশের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার মানসে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শাহাদত হচ্ছে সে কাজ যা' হঠাৎ করে বিপ্লবাত্মক পন্থায় মানুষ সম্পাদন করে এবং এর দ্বারা সে তার ইতর-সত্তাকে প্রেম ও ঈমানের আগুনে নিক্ষেপ করছে, রূপান্তরিত করছে সেটিকে নূর ও ঐশী সত্তায়।

এ জন্যেই শহীদদের কোন জানাজা বা কাফনের প্রয়োজন হয় না, শেষ বিচারের দিনে তাঁকে কোন জবাবদিহি করতেও হয় না। শহীদ'ত তাঁর সকল ভ্রান্তি এবং পাপের কারণ উৎসর্গ করেছে মৃত্যুর মাঝে এবং এখন সে জেগেছে সাক্ষ্য দানের জন্যে।

এ কারণেই আশুরা দিবসের পূর্ববর্তী সন্ধ্যায় ইমাম হোসাইন বড়ই যতনে দেহ ধৌত করছেন, নিষ্কলঙ্কভাবে সম্পাদন করছেন ক্ষৌরকর্ম, পরিধান করছেন মূল্যবান পোশাকাদি, সর্বোৎকৃষ্ট সুঘ্রাণ দ্রব্য ব্যবহার করতেও ভুলেননি তিনি। মৃত্যুর শোণিত প্রবাহে একাত্ম হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর সকল উত্তরাধিকারীদের হারিয়েছেন এবং মহাপ্রস্থানের এ দ্বারপ্রান্তে এসে তিনি দেখলেন শহীদের সংখ্যা বাড়ছে, তাঁরা একে অন্যের ওপর শায়িত—তার কপোল অধিকতর রক্তিম ও উদ্দীপনাময় হচ্ছে। উৎসাহে দ্রুততর হচ্ছে তাঁর হৃদস্পন্দন। তিনি জানেন তাঁর 'উপস্থিতি' সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এখন শাহাদত নিজেই উপস্থিত।

শাহাদত, সংক্ষেপে বলতে হয়, অন্যান্য চিন্তাধারায় এটিকে যেমন একটা দুর্ঘটনা, একটা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া, একজন বীরের ওপর চাপিয়ে দেয়া মৃত্যু, একটি বিস্ফোরণাত্মক ঘটনা আমাদের সংস্কৃতিতে তা' নয়—এটা একটা দরজা, একটা উন্নত অবস্থান, একটা উচ্চমর্যাদা। এটা হচ্ছে স্বকীয়তা—একটা পূর্ণতা—উত্থান। মানবতার উচ্চতম চূড়ার দিকে এটা নিজেই একটা মধ্যবর্তী পথ—একটি সংস্কৃতি।

সকল যুগে, সকল শতাব্দিতে যখন কোন বিশ্বাস বা আদর্শের ধারকদের ক্ষমতা থাকে তখন তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা এবং জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কিন্তু যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ করার কোন উপকরণ থাকে না তখন শাহাদতের মাধ্যমে তারা তাদের জীবন, আন্দোলন, বিশ্বাস, মর্যাদা, সম্মান, ভবিষ্যৎ এবং ঐতিহ্য রক্ষার বিষয় নিশ্চয়তা বিধান করে। শাহাদত হচ্ছে একটি আহবান, সকল যুগ এবং সকল বংশধরদের জন্যে, আর তা' হচ্ছে যদি তুমি মারতে না পার তবে মৃত্যুকে বরণ কর।

# দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রার্থনা

সাধারণতঃ বক্তব্যের শেষে আমি মুনাজাত করি না, কেননা বিনম্রতার সঙ্গে বলতে হয় যে, প্রার্থনা করার উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে আমি বিষয়গুলো যথার্থভাবে বুঝবার ব্যাপারে আল্লাহর মদদ চেয়ে কিছু প্রার্থনা রাখতে চাই—কে কি ভাববেন এটা ধর্তব্য নয়।

আমাদের প্রার্থনার কিতাবসমূহে এটা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ্যালেকসিস ক্যারেল বলেছেন যে, প্রার্থনা হওয়া উচিত এমন এক শিশুর বুলির মত যে পিতার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েছে। যত বেশী স্বতঃস্ফূর্ততা এতে থাকবে তত বেশী এটি গ্রহণ করা হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা একটা চরম সংকটের মধ্যে বসবাস করছি। আমার সকল প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস তোমাদের তথা যুবকদের জন্যে নিবেদিত। যারা প্রাপ্তবয়স্ক তারা একটা অবস্থায় পৌঁছেছেন, শিক্ষিত হয়েছেন এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেছেন। যাদের সম্পদ আছে, আছে সমাজে সম্মানজনক অবস্থান, যা কিছু তারা অর্জন করেছে সেগুলো রক্ষা করাই যেন তাদের দায়িত্ব। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যেহেতু তোমরা সে সকল কিছু থেকে বঞ্চিত, আমাদের মুক্তির জন্যে তোমরা কিছু করতে পার—নয়তো সব কিছুই বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যাবে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হে প্রভু, তুমি যে আদম সন্তানদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছ, তাদের স্কন্ধে তোমার বিশ্বাসকে চাপিয়েছ, সকল নবীদেরকে তোমার কিতাব শিক্ষা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছ, তুমি বলছ যে সকল শ্রেষ্ঠত্ব তোমারই এবং এটাও বলছ যে পয়গম্বরগণ এবং আমরা যারা বিশ্বাসী তারা তোমারই লোক।

তোমার প্রতি আমাদের বিশ্বাস রয়েছে এবং তোমার নবীর বাণীর প্রতিও। আমরা মুক্তি, সচেতনতা, ইনসাফ এবং মহত্ত্ব লাভের জন্যে প্রার্থনা করছি। এ'সব আমাদের জন্যে মঞ্জুর কর—আমরা বড়ই প্রয়োজনানুভব করছি এ'সবের। যে'কোন সময়ের চেয়ে এখন আমরা অধিকতরভাবে দাসত্ব, জাহেলিয়াত এবং দুর্বলতার বেদীতে আত্মাহুতি দিয়েছি।

হে বঞ্চিত মানুষের প্রভু। তুমিত সে-ই যে পৃথিবীর বঞ্চিতদেরকে গৌরবান্বিত করেছ, গৌরবান্বিত করেছ সে সকল জনতাকেও যারা পার্থিব জীবনে দুর্বলতা ও বঞ্চনার কারণে অবহেলিত এবং তাদেরকেও যারা সমগ্র ঐতিহাসিক সময়ে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ এবং অত্যাচার ও কালের ধ্বংসযজ্ঞে আত্মবলি দিতে বাধ্য হয়েছে—আমরা সে'সব হতভাগা যাদের দুনিয়ার জীবন একটা নরক। আমাদের মধ্যে জাগরণ দাও যাতে করে মনুষ্যকুলের নেতৃত্ব আমরা পরিচালনা করতে পারি এবং ভূ-মণ্ডলের উত্তরাধিকার লাভ করি। আজ সময় এসেছে। পৃথিবীর বঞ্চিতরা তোমার ওয়াদার দিকে চেয়ে আছে। মানবকুল যা' তোমার পরিবারভুক্ত সেখানে তুমিই একমাত্র গৌরবময়, বর্তমানে, শুধু বঞ্চিত সাধারণ মানুষই তোমার আরাধনা করছে।

হে স্রষ্টা, সকল ফিরিশতাদেরকে তুমি আদমের সম্মুখে অবনত করেছিলে। কিন্তু তুমি কি দেখছ না যে, আদমের আওলাদদেরকে আজ পার্থিব শয়তানদের সম্মুখে মস্তক নত করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মুক্তি দাও আদমের সন্তানদেরকে যারা বর্তমান শতকের সে'মূর্তিসমূহের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ যে মূর্তি আমরা নিজেরাই তৈরী করেছি। যাতে তোমার দাসত্ব ও আনুগত্যের মধ্যে মুক্তি খুঁজতে পারি সে ব্যাপারে আমাদের সাহায্য কর।

হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, সে সকল লোকদের তুমি ধ্বংস কর যারা দুনিয়ার শাসনক্ষমতার মালিক অথচ তোমার নিদর্শনকে অস্বীকার করছে, হত্যা করে তোমার নবীদেরকে এবং তাদেরকেও নির্মূল কর যারা জনতার মাঝে বিদ্রোহ বা সীমালংঘন ডেকে এনেছে। জনতাকে ন্যায়বিচার এবং সাম্যের দিকে ডেকে নাও।

হে প্রভু, আমাদের ধর্মীয় বিশারদদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত কর, জনতাকে দাও প্রজ্ঞা, বিশ্বাসীদেরকে দাও আলো ও সচেতনতা, বুদ্ধিজীবীদের দাও ঈমান, সৎ লোকদের জ্ঞান দান কর, হতাশাগ্রস্তদের প্রেরণা দাও, আমাদের নবীদের মধ্যে বোধোদয় কর, লোকদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ দাও, বয়স্কদের দাও উপলব্ধি, আমাদের যুবকদের মাঝে পয়দা কর বুদ্ধিমত্তা, অধ্যাপকদের মধ্যে জাগাও আদর্শিক চেতনা এবং আদর্শবোধ জাগাও ছাত্রদের মধ্যেও। যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগাও।

যারা জেগেছে তাদেরকে দৃঢ়তা দাও, সত্যের সন্ধান দাও আমাদের প্রচারকদেরকে, ধার্মিকদেরকে দাও ধর্ম, লেখকদের মধ্যে জাগাও প্রত্যয়, শিল্পীকে দাও কলম, কবিদের দান কর বোধশক্তি, বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে রাখ লক্ষ্য, হতাশাচ্ছন্নদেরকে আশা দাও।

আমাদের বঞ্চিতদেরকে শক্তি দাও, রক্ষণশীলদের দাও আঘাত, যারা জাগতে চায় তাদের জাগাও। যারা স্থির নির্জীব তাদের মধ্যে তৎপরতা পয়দা কর, মৃতদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার কর, অন্ধদেরকে দাও দৃষ্টি, নীরবতার মাঝে দাও সরবতা, মুসলমানদের দান কর কোরআন, আলীকে দাও আমাদের শিয়া মাযহাবে, বিভিন্ন মাযহাবের মাঝে দাও ঐক্য। হিংসুকদের সে' ব্যাধি নিরাময় কর। আত্মাভিমানীদের মধ্যে ইনসাফ, ভর্ৎসনাকারীদের মধ্যে সদাচরণ, আমাদের মুজাহিদদের মধ্যে ধৈর্য, আমাদের জনতার মাঝে আত্মসচেতনতা এবং আমাদের জাতির সবাইকে উচ্চাকাংখা ও অধ্যবসায় দান করে। আমাদেরকে পরার্থপরতা, মুক্তির গুরুত্ব এবং আত্মমর্যাদাবোধ শিক্ষা দাও।

হে কা'বার স্রষ্টা! এ' পৃথিবীর এসকল লোকেরা যারা প্রভাত থেকে রজনী পর্যন্ত সময়ে করণীয় সব নামাজ যথারীতি সম্পাদন করছে, তোমার ঘরে পৌঁছেছে, ইব্রাহীমের ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করছে তাদেরকে তুমি জাহেলিয়াত ও খোদাদ্রোহীদের খলীর জন্তুতে পরিণত কর না এবং নমরূদের সময়কার অত্যাচারীর মত বর্তমান অত্যাচারের হোতাদের জোয়ালে আবদ্ধ কর না।

হে মুহাম্মদ!
হে স্বাধীনতা, জাগরণ ও ক্ষমতার নবী
বিচ্ছুরণমুখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা এক
জ্বলিছে তোমার গৃহে।

পশ্চিম হতে সর্বগ্রাসী প্লাবন এক
আসছে ধেয়ে তোমার ভূ-খণ্ড পানে
উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহে।

বহু যুগ ধরি আছলরা তোমার শায়িত
ধূলিত শয্যায়,—গভীর নিদ্রায় বিভোর
জাহেলিয়াতের জিন্দানখানায়।

ঐ ঘুমন্ত অচেতনদের তুমি জাগাও।
'জাগ এবং তাদের স্মরণ কর'
তুমি বল—বলেননি কি আল্লায় ?

তুমি হে আলী।
খোদার সিংহ, খাঁটি বান্দা তাঁর
হে আপনজন প্রেমিক নিষ্কলুষ ;
আঙ্গীকার রক্ষার সম্রাট।

যোগ্যতা হারিয়েছি তোমাকে বুঝবার
ওরাও চাইছে ভুলে যাই মোরা তোমায়
কিন্তু রুদ্ধ হয়নি ভালবাসার কপাট।

বিবেকের গহীনে স্মৃতির কোঠায় তুমি আছ
জ্বালিয়ে রেখেছ এক আগুন অহর্নিশি
তাকাও তব প্রেমিকদের পানে।

দেখ কোন হীন গহ্বরে নিপতিত তারা
এ অবমাননা তুমি কেমন করে সইবে বল ?
বল কেমনে কর বরদাশত ?

অথচ সহনি ইয়াহুদী রমনীর প্রতি অবমাননা
এতটুকু অন্যায়ের দাওনি প্রশ্রয় সে স্বর্ণময় যুগে
কিন্তু মুসলমানরাই আজ বরবাদ।

মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে দেখ তুমি আজ,
মুসলমানের কণ্ঠে আজ ইয়াহূদী শৃংখল
নির্যাতন নিষ্পেষণ।

চেয়ে দেখ, কি ঘটছে তাদের প্রতি!
হে অস্ত্রের মালিক, অসি ধারণকারী
আঘাত হানো পুনর্বার।

সারা দুনিয়ার সালাত হতেও উত্তম
সে অসির আঘাত। আঘাত হানো
কোষমুক্ত হোক তরবারী তোমার।

হে জয়নব!
হে আলীর কন্যা আলীর কণ্ঠ
কথা কও স্বীয় কওমের সনে আজ
হে মহিয়সী বীরাঙ্গনা!

সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক তুমি
তোমার সাহসিকতা শিক্ষণীয় নিদর্শন
ছাত্র তব হতে পারে সবজনা।

জাগা সবার মাঝে স্বকীয়তা নিয়ে
সর্বত্র আজ তোমার প্রয়োজন
বড়ই দুঃসময় এটি।

অজ্ঞতা, দাসত্বের শৃংখলে বন্দীত্ব
আমাদের দিয়েছে ঠেলে হীনতার মাঝে
দেখ, কি ভাবে ইতর জীবন কাটি।

প্রতীচ্যের দাসানুদাসরা নিক্ষেপ করছে আমাদের
আধুনিকতা হীনতার মাঝে—পরিচয় দিচ্ছে মুছে।
তোমার এবং অতীতের সনে।

লড়তে হবে সাবেকী ও নব্য নিবুদ্ধিতার বিরুদ্ধে
তাইত সাহায্যের আজ বড় প্রয়োজন
প্রেরণা দাও এ' প্রয়োজনে।

পাশ্চাত্যের শৃংখল করতে হবে চূর্ণ
ছাড়তে হবে দুর্নীতিময় ঐতিহ্যের আনুগত্য
শয়তানী সংস্কৃতি, দাসত্ব।

সে আওয়াজ তুলবার প্রেরণা দাও সবাকে
যে আওয়াজ তুমি তুলেছিলে ত্রাসের শহরে
যা' কাঁপিয়ে দিয়েছিল এক রাজত্ব।

ভেতর থেকে বিদ্রোহ উত্থিত হওয়া তক
কল্পমান ছিল সে বিশ্বাসঘাতকতার সবুজ প্রাসাদ
প্রতারক উর্মিনভর গাঁথা জাল।

ধ্বংসের যে সায়লাব আসছে ধেয়ে
তা' প্রতিরোধের যোগ্যতা করতে হবে অর্জন
ধ্বংস করতে হবে সব নাপাক চাল।

স্ত্রী জাতির প্রতিভূদের ওরা করিছে অবমাননা
বানিয়েছে চিত্তবিনোদনের পণ্য—বিক্রয়যোগ্য সম্ভার
পুঁজিপতির লোভের সামগ্রী।

বুর্জোয়াদের মনতুষ্টির জন্যে ওরা করে সব
ওরা নব্য অভিজাততন্ত্রের দাসানুদাস, ক্রীড়নক
গড়েছে বিনোদন কেন্দ্র-প্রেক্ষাগৃহ।

নারী আজ করে প্রাণ সঞ্চার আয়েসীদের জলসা ঘরেই
রূপান্তরিত হয়েছে অজ্ঞাতসারে ওদের কাম-সহচরী
শূন্য, লক্ষ্যহীন বিষণ্ণ জীবনে।

নারীদেরকে দাও নেতৃত্ব, দাও মুক্তি
এ' অবমাননাজনক নব্য-পণ্যবাজার থেকে
চেতনা দাও সবাকার মনে।

আপনি হে আলীর কণ্ঠস্বর
স্বীয় স্কন্ধে করেছেন গ্রহণ হোসাইনের মিশন।
হে' কারবালা প্রত্যাবর্তনকারিণী
ইতিহাসের তরে শাহাদতের বাণী করেছেন বহন।

ফাঁসির মঞ্চ আর খুনের স্রোতে
সে বাণী হয়ে পড়েছিল আবদ্ধ, স্তব্ধ, ক্ষীণ।
সোচ্চার হও হে জয়নব আমাদের সনে
তব কাছে চাই না জানতে সে সব ঘটনা, যা' হীন।

শোনবার প্রয়োজন নেই আমাদের
রক্ত মরু প্রান্তরের সব ঘটনা, দৃশ্য সকল
কিংবা দাবী নয় এই যে তুমি বলবে
অপরাধের সব কাহিনী যা' ইসলামী ইতিহাসে বিরল।

অত্যাচার আনাচারের কাহিনীও চাই না জানতে,
চাইনা জানতে ফোরাতের তীরে, তায়াক্ষের সব ঘটনা,
কিংবা সে' বান্দার মাহাত্ম্য ও গৌরবের কাহিনী শুনতে
ও' সব অজানা নয়, নয় মোদের কামনা।
সে দিন ফিরিশতারা বুঝেছে—
আদমকে কেন করতে হবে সিজদা।

তোমার দুশমন কিংবা মিত্রদের কথা
চাইনে শুনতে, নেই তাতে ফায়দা।
হোসাইনের বিপ্লবের ওহে বার্তাবহনকারিণী।
আমরা সব জানি—সব আমরা শুনেছি
শহীদদের সব কাহিনী—কোনটি তুমি বলনি ?
তুমি নিজেইত শহীদ এ সত্যও আমরা বুঝেছি।
তব ভ্রাতার প্রতিটি রক্তবিন্দু কয় কথা
তুমিওত' রক্ত-শপথ নিয়ে পৌঁছিয়েছ সব গাঁথা।
কিন্তু ভগ্নি! দেখাও পথ আমাদের।
দেখ এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমাদের দুঃখ-কষ্টের।
আমাদের তরে' ত তোমাকে কাঁদতেই হবে।
তব অনুজের হে বিশ্বস্ত বার্তাবহনকারিণী
পৌঁছিয়েছ তুমি শহীদের বাণী—সেত কবে
বহু আগে, কারবালা হতে ফিরে—ভুলিনি।
তব আচ্ছাদনে নব-পরিস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ
তুমি'ত এনেছ শহীদদের লাল বাগান হতে
হে আলী-তনয়া—হে কাফেলার অগ্রাভিযাত্রী, হে গর্ব
সঙ্গে নাও মোদের তোমার সে' কাফেলার সাথে।

হে হোসাইন!
মোরা যোগ্যতা হারিয়েছি তব সম্মুখে কিছু বলতে
দরিয়ার মাঝে তমসাচ্ছন্ন ঘোরকৃষ্ণ রজনীতে
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা ও ঘূর্ণিবায়ুর ভয়ে আমি ভীত
কি বলবো তোমায়—আমিত লজ্জিত, কুণ্ঠিত।

(উম্মতে) সংবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আমরা দায়িত্বশীল। যেহেতু কোরআনে আমাদের বলা হয়েছে, আমরা তোমাদেরকে একটা মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে তৈরী করছি, এজন্যে যে তোমরা অন্যদের কাছে সাক্ষ্য পৌঁছাবে যেমন নবী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে ছিলেন, "সুতরাং সব শহীদ, মুজাহিদ, নেতা, সিপাহসালার, বিশ্বাসীবৃন্দ এবং আমাদের কিতাব তথা এসব অমূল্য সম্পদসমূহের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে বিশ্বজনতার সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ সমাজ কায়েম করার দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা প্রাপ্ত। এ' সাক্ষ্য বহনের দূত হিসেবে নিজেকে পরিণত করুন।

এ বড় কঠিন সিদ্ধান্ত। যারা আমরা ব্যক্তিগত জীবন পরিচালন করতেই পারিনে তাদেরকেই দেয়া হয়েছে জীবন দেয়ার, মনুষ্য সমাজে আন্দোলন সৃষ্টি করার এবং তা সফল করার দায়িত্ব। হে খোদা, এর মধ্যে কোন্ কৌশল লুক্কায়িত! আমরা যারা ক্লেদাক্ত ও পশুবৎ জীবনের গদবাঁধা কর্মের মধ্যে নিমজ্জিত আছি, আমরা কি বিলাপ করতে পারি, পারি কি বিলাপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে, তাদের জন্যে, সে সকল নারী, পুরুষ এবং শিশুরা যারা কারবালায় শাহাদতের নিদর্শন রেখেছেন এবং ইতিহাসে সাক্ষ্য রেখেছেন আল্লাহর সম্মুখে—মুক্তিকামী মানুষের সম্মুখে চিরদিনের জন্যে?

হে স্রষ্টা! হোসাইনের বংশধরদের ওপর আবার কোন ধরনের অত্যাচার শুরু হয়েছে। শহীদ তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। আজ রজনীর মধ্যভাগে তাঁদের জন্যে আমরা আহাজারি প্রদর্শন এবং তাদের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আপনি লক্ষ্য করুন, হোসাইনের জন্যে মায়াকান্না এবং ভালবাসার ছত্রছায়ায় অবস্থান করেও, কিভাবে আমরা সে ইয়াজিদকে সহায়তা করছি যে' চায় এ' ইতিহাস মুছে যা'ক। শহীদরা তাঁদের দায়িত্ব আনযাম দিয়েছেন, এখন নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

শিক্ষকবৃন্দ, মুয়াজ্জিন, যুব সম্প্রদায়, শিশুরা, মহিলারা, এবং ভৃত্যরা, তাঁরা সবাই মিলে কি এমন একটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যারা সম্মিলিতভাবে জীবন্ত মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারে? এ সকল শহীদগণ দু'টি কাজ সম্পাদন করেছেন—হোসাইনের সন্তানাদি থেকে তাঁরা ভ্রাতা পর্যন্ত—

তাঁর ভৃত্য থেকে স্বয়ং তিনি নিজে—কারীগণ থেকে আরম্ভ করে কুফার শিশুদের শিক্ষকগণ পর্যন্ত—মুয়াজ্জিন থেকে আরম্ভ করে এ ব্যাপারে আগুন্তক সবাই—সমাজের মহৎ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ থেকে আরম্ভ করে সামাজিক মর্যাদাহীনরা পর্যন্ত—সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের সৌহার্দ্য নিয়ে তৎপর হল, উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং যুবক তথা ইতিহাসের সরাইকে শিক্ষা দেয়া ঃ বাঁচা যদি সম্ভব তবে কিভাবে বাঁচতে হবে আর যদি সম্ভব না হয় তবে কিভাবে মরতে হবে।

এ শহীদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং তাঁরা অন্য একটি লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন রক্ত দিয়ে, কথা দিয়ে নয়। তাঁরা তৎকালীন প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে সে ইতিহাসের আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন যে ইতিহাস মনুষ্য সমাজের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। এটা একটা এমন ব্যবস্থার প্রশ্ন যা' নীতি-নির্ধারণ, অর্থনীতি, ধর্ম, কলা, দর্শন, চিন্তাধারা, আবেগ, নৈতিকতা এবং মানবতাবোধের ধরন নির্দিষ্ট করে। আর এটা একটা এমন ব্যবস্থা যার জন্যে তার অনুসারীরা আত্মাহুতি দিতেও কুণ্ঠিত নয়। তাঁরা ঘৃণার সঙ্গে বিরোধিতা করেছে তাদের শাহাদতের দ্বারা এমন সব দলভুক্ত মানুষের এবং মানবিক মূল্যবোধসমূহের যেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাচারী ঘাতক সরকারের তল্পীবাহী শক্তি হিসেবে।

ইতিহাসের পাতায় একজন শাসক, একজন নিপীড়ক আছে যে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সে খুনী শহীদ করেছে অনেক। এ' ঐতিহাসিককালে অগণিত মানুষ ঘাতকদের শিকারে পরিণত হয়েছে। নিস্তব্ধ হয়েছে অনেক নারী জল্লাদদের বেত্রাঘাতে। অনেক রক্ত ভক্ষণ করে দুরান্তরের স্থানসমূহেও এর ব্যাপ্তি ঘটান হয়েছে। জঠর জ্বালায় পীড়িতরা, ভৃত্যরা, নারী ও শিশুগণ, সবাই ধ্বংস হয়েছে যেমন হয়েছে পুরুষ, বীর, সেবকগণ, শিক্ষকবৃন্দ সকল যুগে সকল বংশধরদের মধ্যে।

আজ হোসাইন ফুরাতের তীরে, ধরার বুকে তাঁর যা' কিছু আছে সব কিছু নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছেন ইতিহাসের বুকে সাক্ষ্য দিতে—ইতিহাসের নির্যাতীতদের সম্মুখে এবং তাঁদের সম্মুখে যারা ইতিহাস নিয়ন্ত্রণকারী ঘাতকদের দ্বারা নিহত হয়েছেন।

তিনি তাঁর পুত্র শিশু-সন্তান আলী আকবর সহ সাক্ষ্য দিতে এলেন সে ঘাতকের বিরুদ্ধে, যে সারা ইতিহাসে যুবকদের মগজ ভক্ষণ করেছে।

তিনি এসেছেন সাক্ষ্য দিতে এ' বিষয়ে যে, অপরাধী শাসন ব্যবস্থা ও ঘাতকদের শাসনের বিরুদ্ধে একজন বীর কিভাবে আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি এসেছেন স্বীয় ভগ্নি জয়নবকে সহ, সে ঐতিহাসিক বিধানের পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্যে যা হচ্ছে, হয় স্ত্রী জাতিকে দাসত্ব বরণ করতে হবে এবং এজন্যে তাকে হেরেমের কোঠরায় বন্দী থাকতে হবে অথবা স্বাধীনতার পথকে বেছে নেয়ার কারণে শাহাদতের কামনা নিয়ে বিরাজ করতে হবে তাকে বিজিতদের কাফেলা নেতৃত্ব দানের অভিপ্রায়ে।

ছোট্ট শিশু আলী আকবর সহ তিনি এসেছেন সাক্ষ্য দিতে, কিন্তু অত্যাচারী, অপরাধী শাসকগোষ্ঠী এবং নিপীড়ক ঘাতকরা দুধের শিশুর প্রতিও করুণা প্রদর্শন করল না।

হোসাইন উপস্থিত হয়েছেন তাঁর সমগ্র সত্তা নিয়ে ইতিহাসের একটি ফৌজদারী আদালতে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়েছেন যারা শাহাদত প্রাপ্ত এবং মৃত্যবরণ করেছেন অরক্ষিত অবস্থায় নিভৃতে। যা কিছু প্রিয় সম্পদ তাঁর ছিল এবং সকল সম্ভাবনা, সব বিসর্জন করেছেন তিনি, তাঁর শাহাদতের পর আদালতের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে এখন। তিনি এ ভাবে তাঁর ঐশ্বরিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! শিয়া মাযহাবের প্রশ্নে যখন কেউ আলোচনা করে, বিশেষ করে নিষ্কলুষ, জাগ্রত এবং সচেতন শিয়া-চিন্তাধারার কথা বুঝতে দুশমনদের নিকট পরাজয় বরণ এবং বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যাক্ত হওয়ার উর্ধেও সেখানে রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট শিক্ষা ও বাণী, রয়েছে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। তিনি হচ্ছেন একটি মূল্যবান সম্পদ যা সমাজকে, জাতিকে, বংশধরদেরকে এবং ইতিহাসকে দেয় একটা জীবনী শক্তি।

শাহাদত হচ্ছে শিয়া মাযহাবের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবনী শক্তি দায়িনী উৎস। জালাল আল-আহামদ বলেন, "আমরা শাহাদতের ঐতিহ্য ভুলে গেছি এবং আমরা তাদের মত হয়ে পড়েছি যারা শাহাদতের আনুষ্ঠানিকতাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আমরা হচ্ছি কাল-মৃত্যুর ধারক ও বাহক।

আলী, হোসাইন এবং জয়নবের শিয়া মাযহাব তথা শাহাদতের অনুসারী না হয়ে আমরা চিরস্থায়ী বিলাপের পথ বেছে নিয়েছি। কত বিচক্ষণতার সাথেই না আমরা হোসাইন এবং তাঁর মহান, প্রিয় ও চিরঞ্জীবী বন্ধুদের বাণীকে পরিবর্তন করেছি। সে বাণীত সকল মানুষের জন্যেই।

হোসাইন যখন দেখলেন যে তাঁর সকল প্রিয়জনরাই নিহত হয়েছেন, কেউ নেই তার সম্মুখে, আছে শুধু ঘৃণিত এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শত্রুরা, তখন তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বলেন, "এমন কি কেউ আছ যে আমাকে সাহায্য করতে পারে?"—এ কথার মাহাত্ম্য কোথায়? এটা কি তিনি জানতেন না যে, কেউ নেই তাঁকে সাহায্য করবে? তিনি মানব জাতির ভবিষ্যত ইতিহাসের কাছে এ' প্রশ্ন রেখেছেন। এ প্রশ্নে সম্বোধন করা হয়েছে অনাগত কাল ও আমাদের প্রতি। হোসাইন তাঁর প্রেমিকদের নিকট থেকে যা' আশা করেন এ প্রশ্নে তারই ব্যাখ্যা। এ প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি তাঁর আহবানের বিষয় যারা শাহাদত এবং শহীদের প্রতি মর্য্যাদাবোধ পোষণ করেন তাদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন।

যিনি শিয়া সম্প্রদায় এবং তাঁর অন্যান্য অনুসারীদের সকল যুগে, সকল ধংশধরদের নিকট সাহায্য কামনা করেছেন এ'হোসাইনের বাণীকে, সহায়তা লাভের প্রত্যাশাকে, তাঁর আহবানকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে আমরা জনতার সম্মুখে ঘোষণা করছি যে, হোসাইনের প্রয়োজন অশ্রু ও বিলাপ তাঁর কোন বক্তব্যই নেই। তিনি নিহত হয়েছেন এবং তাঁর জন্য প্রয়োজন শুধু রোনাজারি—উত্তম। কিন্তু শহীদ যিনি সাক্ষ্য বহন করেন সকল কালে সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী থাকাটাও জরুরী নয় কি? হাঁ, এর পরও তারা বলতে থাকবে, 'না'।

প্রত্যেক বিপ্লবের দুটি স্তর আছে। প্রথমটি হচ্ছে রক্ত, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাণী। শাহাদত অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য বহন করা। যারা রক্তাক্ত মৃত্যুকে পথ হিসেবে গ্রহণ করছে সে সত্যের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের নিমিত্তে যা' অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসরমান আর এ জিহাদের পথে অন্যতম অস্ত্র হচ্ছে বিপর্যস্ত মূল্যবোধ।

শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখেই নয় প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক শতাব্দিতে, সকল কালে, সর্বত্র জনতাসাধারণের সম্মুখে একে উপস্থাপিত ও জীবন্ত করতে হবে এবং এর সাক্ষ্য দিতে হবে। এ'প্রাণময় জীবন-

যাপনের প্রশ্নটিতেও যারা হীনমন্যতার উর্ধে উঠতে পারে না তারা হচ্ছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ের নিষ্প্রাণ ক্লেদাক্তক জঞ্জাল। কিন্তু তাঁরা, যারা স্বীয় মৃত্যুকে লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে এবং মহানুভবতার সঙ্গে হোসাইনের পাশাপাশি আত্মাহুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, বেঁচে থাকার পক্ষে হাজারো যুক্তি তাদের বিরত করতে পারে না, যুক্তি-তর্কের উর্ধে অবস্থান করেই তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেছেন। তাঁরা কি জীবন্ত, না ওরা, যারা বেঁচে থাকার জন্যে ইয়াজিদের আনুগত্য করার মত হীনতা ও হীনমন্যতার প্রশ্রয় দিয়েছে এবং হোসাইনকে ত্যাগ করেছে? কারা আজও বেঁচে আছে? তারাই বেঁচে আছে যারা জীবনকে শুধুমাত্র গতিশীল দেহসর্বস্ব কিছু মনে করে না। তাঁরাই প্রাণময় যারা হোসাইনের অস্তিত্বকে অনুভব করে এবং তাঁর অস্তিত্বের যারা সাক্ষ্য দেয়—নিজস্ব সকল সত্তাসহ। তাঁরাই বেঁচে থাকে যারা এ'সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম যে জীবনের মায়ায় যারা দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছে তারাই মৃত।

তাঁরা এবং শহীদগণ দৃষ্টান্ত রাখছে, শিক্ষা দিচ্ছে এবং এ'বাণীর সাক্ষ্য বহন করছে যে, অক্ষমতাই অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেয় না। শাহাদত এ যুক্তির স্বীকৃতি দেয় যে, দুশমনের উপর বিজয়ী হওয়াটাই হচ্ছে সফলতা। শহীদ হচ্ছেন সে'ব্যক্তি যিনি দুশমনকে পরাজিত করতে অক্ষম হলে স্বীয় মৃত্যুকে বরণের মাধ্যমে সফলতায় পৌঁছায় এবং দুশমনকে পরাভূত করতে না পারলে, তাঁর ঘৃণিত মুখের ছদ্মাবরণ উন্মোচন করে দেয়।

একজন শহীদ হচ্ছেন ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র। হৃদপিণ্ড যেমন সারা দেহে রক্ত ছড়িয়ে দেয় শহীদও রক্ত সঞ্চার করে ইতিহাসের অবয়বে। এক সমাজ যা' অবক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে, জনতা 'যেখানে' ঈমান হারিয়ে ফেলছে, যা' ক্রমে মৃত্যুর দিকে ধাবমান, যারা আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়েছে, যেখান থেকে দায়িত্ব বোধ তিরোহিত, যেখানে মানুষ হওয়ার বিশ্বাস বিস্মৃত, যার উর্বরতা এবং আন্দোলনী চেতনা ধ্বংস হয়েছে, সে ক্ষেত্রে একটি শহীদ হৃদপিণ্ডের মত সে' শুষ্ক মৃত এবং নির্জীব সামাজিক ফসলে শোনিত সঞ্চার করে।

এ'শাহাদতের সর্বাধিক গুরুত্ববহ বিস্ময় হচ্ছে যে এটি একটি যুগের বংশধরদের মধ্যে এক নতুন বিশ্বাসের জন্ম দেয়। তাই শাহাদত হচ্ছে সর্বকালে বিরাজমান, চিরঞ্জীব!

অনুপস্থিত কে ? হোসাইন স্বীয় শাহাদতের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা' তাঁর হজ্জ সমাপণ না করেই শাহীদ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত। যে হজ্জ তাঁর বংশানুক্রমিক তথা তাঁর মাতামহ এবং তাঁর পিতার সংগ্রামের নবায়ন তিনি তা' অসমাপ্ত রেখে দেন। তিনি তাঁর হজ্জব্রত পালনের চেয়ে শাহাদতকে অধিকতর গুরুত্ব দিলেন। মধ্যবর্তী সময়েই তিনি হজ্জ অনুষ্ঠান ত্যাগ করলেন ইতিহাসের সকল হাজীদের শিক্ষাদানের জন্যে, ইতিহাসের সকল প্রার্থনার জবাব দানের অভিপ্রায়ে,— হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সকল বিশ্বস্ত অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যে, যখন কোন ইমামত বা নেতৃত্ব থাকবে না, থাকবে না কোন লক্ষ্য এবং যদি হোসাইনের পরিবর্তে ইয়াজিদ অবস্থান করে তখন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা দেব-দেবীর ঘর তাওয়াফ করারই নামান্তর।

যখন হোসাইন হজ্জ সমাপণ বিরত রেখে কারবালার দিকে অগ্রসর হলেন, ইমাম হোসাইনের অবর্তমানে যারা তখন তাওয়াফ করছিলেন, তাদের সে তাওয়াফ'ত মুয়াবিয়ার প্রাসাদ তাওয়াফেরই সমতুল্য কেননা শহীদ'ত সেই যে চির বর্তমান। সকল সত্য এবং মিথ্যার ক্ষেত্রে, নিপীড়ন ও ইনসাফের জিহাদে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি উপস্থিত, আর তার উপস্থিতির কারণ সবাইকে তার বাণী পৌঁছে দেয়া। হক আর বাতিলের সংঘর্ষে তুমি যদি উপস্থিত নাই থাক, সেক্ষেত্রে তুমি কোন্ পক্ষে আছ, কোন্ পক্ষে নও এর কোন গুরুত্ব নেই। যদি তুমি সত্য ও মিথ্যার সংগ্রামে তোমার জীবিতাবস্থায় সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হও, তখন তোমার করণীয় বিষয়ের কোন পার্থক্য বিবেচনা করার মত নয়।

শাহাদত সত্য ও অসত্যের চিরন্তন সংগ্রামে সাক্ষ্য বহন করে। এবং অনুপস্থিতি ? তারা সবাই যাঁরা হোসাইনকে একাকী ছেড়ে চলে গেছেন এবং অনুপস্থিত ছিলেন, শাহাদতের পথে তাঁর সঙ্গী ছিলেন না তারা সবাই এক— হোকনা তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা হোসাইনকে একাকী পরিত্যাগ করে ইয়াজিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে ; অথবা তারা সেসব লোকও হতে পারে যারা হোসাইনকে সঙ্গীহীন করে বেহেশত লাভের আশায় ইবাদতের নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট বেদীতে অবস্থান গ্রহণ করছে কিংবা যারা হক ও বাতিলের সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে নিভৃত ইবাদতের বা

বাণী হচ্ছে কি করে সত্যিকারভাবে বাঁচা যায় এবং কিরূপে উত্তম মৃত্যু বরণ করা যায় তারই কলাকৌশল।"

"তুমি যদি ধার্মিক হও তোমার ধর্মের প্রতি অবশ্যই তোমার দায়িত্ব রয়েছে। একজন স্বাধীন মানুষের দায়িত্ব রয়েছে মানবতার মুক্তির জন্যে। তোমার সময়ের সাক্ষ্য বহন কর। তোমার যুগের হক ও বাতিলের সংঘর্ষের সাক্ষ্য দাও তুমি। আমাদের শহীদরা যখন সাক্ষ্য বহন করছে তখন তাঁরা জীবন্ত এবং চিরঞ্জীব। তাঁরা হচ্ছেন আদর্শ নমুনা, তাঁরা হক ও বাতিলের সাক্ষ্য বহন করছে এবং মানবতার লক্ষ্য ও সৌভাগ্যের নিদর্শনও তাঁরা বহন করছে।"

একজন শহীদ এ'সব কিছু আলিঙ্গন করে। প্রত্যেক জিহাদের রয়েছে দু'টি দিক খুন ও বাণী। যে সত্য গ্রহণে ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব নিয়েছে, যে জানে শিয়া চিন্তাধারায় দায়িত্ববোধের কি অর্থ, যে হৃদঙ্গম করতে পারে মানবতার মুক্তির ব্যাপারে আরোপিত দায়িত্বের প্রসংগটি, তাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে ইতিহাসের চিরন্তন যুদ্ধে—সর্বত্র এবং সর্বস্থানে, সকল ময়দানই হচ্ছে কারবালা, সকল মাসই হচ্ছে মুহররম, সকল দিবসই আশুরা এবং এ জন্যে তাঁকে অবশ্যই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে; হয় রক্তাক্ত পথ নয় বাণী বহনের দায়িত্ব, হয় হোসাইন হতে হবে নয় জয়নব, হোসাইনের মত শহীদ হতে হবে নতুবা বেঁচে থাকতে হবে জয়নবের মত, যদি সে চায় অনুপস্থিত রইবে না এবং সব সময় বিরাজ করবে।

শ্রোতাদের নিকট আমি মাফ চাইছি। সময় অতিক্রম হয়েছে, সুযোগ আর নেই। অনেক কিছুই ছিল বলার। কি করে হোসাইনের বিস্ময়কর কাহিনী এবং জয়নব যিনি পূর্ণতা দিয়েছেন তাতে তাঁদের বিষয় একটি মাত্র বক্তৃতায় পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। পরিশেষে শাহাদতের পর জয়নবের মিশনের দীর্ঘকাহিনী আমি চুম্বকে বলতে চাই।

মরেছে যারা দিয়েছে হোসাইনী কাজ আনযাম
বেঁচে আছে যারা বইতে হবে জয়নবী পয়গাম
নয়'ত ইয়াজিদ তারা।

## টীকা-টিপ্পনী

১—এ অনুচ্ছেদাংশটুকু আলী শরীয়তীর 'শিয়াইজম' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত।

২—দৈবক্রমে ওমর খইয়াম আমাদের সংস্কৃতিতে পুনরুত্থিত হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা দুনিয়াবাসীর আকাংখা তিনি পূর্ণ করেছেন। মনে রাখবেন বৈজ্ঞানিক খইয়াম নয় বরং কবি, অংকশাস্ত্রের বিস্ময়কর প্রতিভা খইয়াম নয় বরং সে ধূর্ত খইয়াম যে কবিতা পাঠ করতেন তিনিই। এটা কোন উদ্দেশ্যহীন ব্যাপার নয় যে, কেন অধিকাংশ প্রাচ্যবাদী, ইসলামী তত্ত্ববিদ, ইরান বিষয়ক বিশারদ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং সভ্যতার উপর লিখে লেখার স্তূপ তৈরী করলো এবং সুফিবাদ প্রবর্তনের প্রতি এত আগ্রহ প্রদর্শন করেছে। যেক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক, সাহিত্য, ইসলামী, ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং চিত্র-কলা কর্মসমূহের শতকরা সত্তরাংশ হস্তলিপির মধ্যে সীমিত রয়েছে বিভিন্ন সাধারণ বা ব্যক্তিগত পাঠাগারে, সেক্ষেত্রে সুফিবাদের পুস্তকাদি বিভিন্ন ভাবে বার বার প্রকাশিত হয়েছে। এটা সত্য প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে একটা লক্ষ্য থাকে, হয়তো আমাদের কাছে তা'অজ্ঞাত—সবকিছুই ভাগ্য, ইচ্ছা, অদৃষ্টবাদ ও লক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু সেগুলো নয়, নয় ঐশ্বরিক শক্তি বরং পৃথিবীর প্রভুই এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩—এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ইমাম হোসাইনের অনেক দায়দ্র ও সমানুভূতি সম্পন্ন আত্মীয় যারা হোসাইনের যুক্তি মেনে নিতে পারেনি বরং তাকে বিরত করার চেষ্টা করেছে এবং মহিয়ষী জয়নবের স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের মত তাঁরাও তাঁকে নীরব থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। ইমাম হোসাইন বরং তদীয় সৎ-ভ্রাতা মুহাম্মদ হানিফার নীতি স্বাধীনভাবে অনুসরণের জন্য তিনি (জয়নব) তাকে তালাক দিয়েছিলেন।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—